Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

এলিচ মাহমুদা রিনা

রোলঃ 227020372

১৮ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

এলিচ মাহমুদা রিনা

রোলঃ 227020372

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুফতি: জোবায়ের হাসান, আইডিঃ 227020372 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

এলিচ মাহমুদা রীনা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

এলিচ মাহমুদা রিনা

আইডিঃ 227020372

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

আল্লাহর পথে যাত্রা

মহান রবের ইবাদাতকে উপভোগ করার জন্য রবের সাথে আমাদের আত্মার বন্ধন মজবুত হওয়া চাই। কারণ ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ, আর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য দরকার উপযুক্ত প্রস্তুতি। এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে মূসা (আঃ)-এর কথোপকথনের ঘটনাটি একটি উদাহরণ হতে পারে। কুরআনে উল্লেখিত এই ঘটনায় মূসা (আঃ) আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে এলাম, যাতে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হন।" (সূরাহ ত্ব-হা ২০: ৮৪) মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলাকে দেখতে চেয়েছিলেন। ফিরাউনকে ধ্বংস করার পর আল্লাহ তায়ালা মূসা (আঃ) ও বনি ইসরাইলের জন্য একটি সময় ও স্থান নির্বাচন করে দিলেন। মহান রব তাঁর বান্দা মূসা (আঃ)-কে তুর পাহাড়ের নিচে আসতে বললেন। মূসা (আঃ) হারুন (আঃ)-কে বনি ইসরাইলের সাথে রেখে একাকী আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য বেরিয়ে পড়েন। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত তূর পাহাড়ের দুরুত্ব যত ঘনিয়ে আসছিল, মূসা (আঃ)-ও গন্তব্যের দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মূসা (আঃ) তো তাড়াহুড়া না করে ধীরেসুস্থে এগোতে পারতেন। কিন্তু এটা ছিল তাঁর জন্য এক বিশেষ সাক্ষাৎ-মহা আকাঙ্ক্ষিত। কারণ এই সাক্ষাৎ ছিল স্বয়ং আল্লাহর সাথে! এমন এক সাক্ষাৎ-যা কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না! মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য, একটিবার তাঁর রবের সাথে কথা বলার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। আপনার কাছেও দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ আছে। আসলে রামাদানের প্রতিটা মুহূর্তই আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগ। আপনি চাইলে এই সুযোগ গাফিলতি করে পার করে দিতে পারেন, মূসা (আঃ)-এর মতো তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসার সাথে আল্লাহর সাক্ষাতে দ্রুত এগিয়ে আসতে পারেন, কিংবা চাইলে এই সাক্ষাৎ একেবারেই বাতিল করে দিতে পারেন। সিদ্ধান্ত একান্তই আপনার।

কিন্তু কেন মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য এত উদগ্রীব ছিলেন? কারণ, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ মূসা (আঃ)-এর জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত ছিল। আর এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার পেছনের কারণ হলো, মূসা (আঃ) আল্লাহর ইবাদাত করতে পছন্দ করতেন।

আপনি যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসাকে তীব্রভাবে উজ্জীবিত করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ইবাদাত করে আনন্দ পাবেন না। কেউ যদি কারো ভালোবাসার প্রত্যুত্তরে তীব্র আবেগ ও ভালোবাসাবিহীন আচরণ করে, তার সেই আচরণে যদি কোনো আকাঙ্ক্ষাই না থাকে, তাহলে এই ভালোবাসা সস্তা, মূল্যহীন। আপনার প্রধান কাজ আল্লাহর ইবাদাত। এই ইবাদাতের মাঝে আপনি যদি আল্লাহর প্রতি আপনার আবেগ, তীব্র ভালোবাসা আর আকাঙ্ক্ষা ঢেলে দিতে পারেন, তবেই সেই ইবাদাত আপনার কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠবে। কিন্তু আল্লাহর প্রতি আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসার মধ্যে কেন দুর্বলতা দেখা দেয়? কারণ সময়ের সাথে সাথে আমাদের অন্তরের উপরে রা'আন পড়ে যায়। আল্লাহ বলেন, "কখনো নয়; বরং তারা যা করেছে তা-ই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।" (সূরাহ মুতাফফিফিন ৮৩: ১৪) রা'আন হলো একটি কালো দাগ। প্রতিবার গুনাহ করার পরে গুনাহকারীর অন্তরে একটি করে কালো দাগ পড়ে যায়। যারা তাওবা করে তাদের অন্তর থেকে এই কালো দাগ মুছে যায়। আর যারা তাওবা করে না-এই কালো দাগগুলো তাদের অন্তরকে কালো কয়লার মতো করে দেয়। রামাদান হচ্ছে অন্তর থেকে এই রা'আনকে (কালো দাগ) মুছে ফেলার উৎকৃষ্ট সময়। গুনাহের কারণে আমাদের অন্তরে যে কালো আস্তরণ পড়েছে, তা মুছে ফেলতে হবে। আল্লাহ তাআলার প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। হতে পারে গুনাহের দরুন আমাদের অন্তর আজ মৃতপ্রায়। কিন্তু এই মৃত অন্তরকেও জীবিত করা সম্ভব। গুনাহের কারণে অন্তরে যে কালো আবরণ পড়েছে, সেটাও পরিষ্কার করা সম্ভব। কিন্তু কীভাবে আমরা আল্লাহর প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসা পুনরুজ্জীবিত করতে পারি? এজন্য আপনাকে নিতে হবে চারটি কার্যকরী পদক্ষেপ। কুরআনকে অন্তরে ধারণ করা কুরআন তিলাওয়াত করুন, এর অর্থ বুঝুন এবং অর্থ নিয়ে ভাবুন। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বোঝার চেষ্টা করুন। আরবি না বুঝলে কুরআনের অর্থ পড়ুন, তাফসীর পড়ুন। তাফসীর ইবনু কাসির পড়ুন, এর অনুবাদ পাওয়া যায় এবং এটা আমাদের জন্য একটি বিরাট অর্জন। আমাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে,

কুরআন বুঝতে হলে আগে এই তালা ভাঙতে হবে। আল্লাহ বলেন,“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭: ২৪) এই আয়াতে আসলে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়নি, বরং এর মাধ্যমে আপনাকে কিছু জানানো হয়েছে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তারা কুরআনকে বুঝতে পারে না; কারণ তাদের অন্তর তালাবদ্ধ। কুরআন তিলাওয়াতের সময় কুরআনের ব্যাপারে অসচেতন, অমনোযোগী থাকবেন না। কুরআন তিলাওয়াত করা খুব সহজ, আল্লাহর প্রশংসা করাও খুব সহজ, কিন্তু আপনার মন হয়তো যত্রতত্র ঘুড়ে বেড়াচ্ছ। আর আপনার এই মনকে কুরআনের দিকে, আল্লাহর দিকে স্থির রাখাই আপনার জন্য কঠিন কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি।" (সূরাহ কাহাফ ১৮: ২৮) আল্লাহ তাদের আনুগত্য করতে কেন নিষেধ করলেন, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল? কারণ অনেকেই আল্লাহর যিকির করে, কিন্তু খুব কম বান্দা-ই যিকিরের সাথে সাথে অন্তরকেও আল্লাহর স্মরণে মগ্ন রাখতে পারে। আসুন কীভাবে কুরআন পড়তে হয়, তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখি। কীভাবে কুরআনের একটি আয়াত আবু দাহদা (রাঃ)-কে উজ্জীবিত করেছিল! "কে আছো এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?" (সূরাহ বাক্বারা ২:২৪৫) আল্লাহকে ঋণ! বান্দা দেবে আল্লাহকে ঋণ! আবু দাহদা (রাঃ) এই আয়াত শুনে বিস্ময়ের সাথে নবিজি (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ আমাদের কাছে ধার চাচ্ছেন?' নবিজি (সাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ'। আবু দাহদা (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার হাতটি দিন, আমি কথা দিচ্ছি আমার খেজুর বাগানটি ধার দেব। আবু দাহদা (রাঃ) নবিজি (সাঃ)-কে ৬০০টি খেজুর গাছ সমৃদ্ধ সবচেয়ে ভালো খেজুর বাগানটি দিয়ে দিলেন। আবু দাহদা (রাঃ)-এর অনেকগুলো বাগান ছিল, তিনি ধনী ছিলেন। তিনি তাঁর সবচেয়ে উত্তম বাগানটিতে গেলেন। কোন বাগানটিতে জানেন? যেখানে তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে থাকতেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'সবকিছু গুছিয়ে নাও, আমরা এই বাগান থেকে চলে যাচ্ছি। এই বাগান এখন আর আমাদের নয়, কারণ এই বাগানটি আমি উত্তম ঋণ হিসেবে আল্লাহকে দিয়েছি।'

এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? তাঁর স্ত্রী কি অভিযোগ করেছিলেন? বলেছিলেন, কেন, কী হচ্ছে এসব! না, তিনি কোনো অভিযোগই করেননি, কোনো পাল্টা প্রশ্নও না। তিনি চুপচাপ উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর বাচ্চাদের হাত ধরলেন। তিনি বুঝলেন যে, এই বাগানটি উত্তম ঋণ হিসেবে আল্লাহকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এর মধ্যে যা আছে সেগুলাও আর তাঁদের নয়। কাজেই তিনি বাচ্চাদের হাতে যে খেজুরগুলো ছিল,

সেগুলো নিয়ে নিলেন, এমনকি বাচ্চাদের মুখে যা ছিল তাও বের করে রেখে দিলেন। একেবারে শুন্য হাতে বাচ্চাদের নিয়ে তিনি বাগান থেকে বের হয়ে গেলেন। আল্লাহকে পেতে চাওয়ার তীব্র আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত মানে হচ্ছে এটাই-আল্লাহর কথাকে (কুরআনকে) বুঝতে পারা। কুরআনে যে আদেশ নিষেধ আছে, তা মেনে নেয়া এবং বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের ইতস্তত ভাব বা বাধা সৃষ্টি না হওয়া। যখন নবিজি (সাঃ) আবু দাহদা (রাঃ)-এর প্রতিশ্রুতির কথা শুনলেন, তিনি বলেন, "আবু দাহদা (রাঃ)-এর জন্য জান্নাতে এমন অনেকগুলো বাগান আছে।" [৮] মুসলিম: ২২৮৩

আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুদান স্মরণে রাখা অন্তর থেকে পাপের কালো দাগ দূর করে আল্লাহর প্রতি আশা, আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায় হলো-আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নিয়ামত ও রহমত স্মরণ করা। মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা হলো সে যার দ্বারা উপকৃত হয়, তাকে পছন্দ করে-এটা আল্লাহ তাআলাই মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। মানুষকে কেউ যদি একটি ফুলের তোড়া দেয় বা চাকরি পেতে সাহায্য করে, তাহলে সে উপকারকারীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকে, তার প্রশংসা করে। অনেক সময় এর চেয়েও ছোট ব্যাপারে মানুষ কারো প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তো মানুষকে সবার চেয়ে বেশি দেন। তিনি এমন সব নিয়ামত দেন যা আর কেউ মানুষকে দিতে পারে না। শ্রবণশক্তি, জিহ্বা, দৃষ্টিশক্তি, আকাশ, পৃথিবী, রাত আর দিনের ব্যাপারে কুরআনের অনেক আয়াত আছে। কুরআনের এসব আয়াতের উদ্দেশ্য কী? যাতে করে আল্লাহর রহমত আর নিয়ামতের

স্মরণ আমাদের অন্তরে দৃঢ় হয় এবং আল্লাহর প্রতি আশা, আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আমাদের অন্তর আলোকিত হয়। আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে আপনি যত বেশি জানবেন, যত বেশি অনুধাবন করবেন-আল্লাহর কাছে শুকরিয়া প্রকাশের ইচ্ছা আপনার মধ্যে তত বেশি প্রবল হবে। প্রত্যেক দিন আপনার এবং আপনার পরিবারের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করুন। আর আপনার চারপাশে এমন সব মানুষদেব দেখুন-যাদের কিছুই নেই। আল্লাহর নিয়ামতের কথা ভাবুন, এভাবেই আপনার ভিতরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আর আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আমি ঘুম থেকে নির্বিঘ্নে উঠলাম যখন অনেকেই কারাগারে বন্দী, অনেকের উপরই বোমা বর্ষন করা হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমি সুস্থ আছি। আলহামদুলিল্লাহ! আজ সারাদিন চলার জন্য আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন। নবিজি (সাঃ)-এর এই হাদিসটি স্মরণ করুন, "ব্যক্তি নিজ ঘরে ঘুম থেকে নিরাপদে এবং সুস্থভাবে উঠল, এবং এমনভাবে উঠল যে তার কাছে ঐ দিনের জন্য রিযিক আছে, তবে সে যেন দুনিয়ার সকল কিছু পেয়ে গেল।" অনুতাপ ও তাওবা প্রথমত কুরআনকে অন্তরে ধারণ করা, দ্বিতীয়ত আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা। আর তৃতীয় হলো-অতীতে যে সময় নষ্ট করেছেন, তার ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়ে নিজের অন্তরকে জীবিত করে তোলা। সে সময়গুলোর জন্য অনুতপ্ত হোন-যা আল্লাহর ইবাদাত করার বদলে পাপাচারে অতিবাহিত হয়েছে। এতটাই অনুতপ্ত হতে হবে, যাতে করে আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা পুনরুজ্জীবিত হয়। হৃদয়কে অনুতাপের আগুনে জ্বালিয়ে আল্লাহর কাছে খালিস মনে তাওবা করে নিতে হবে, অতপর সেই অতীত অধ্যায়কে বাদ দিয়ে নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে। এখন একমাত্র লক্ষ্য হবে অতীতে যে ঘাটতি রয়ে গেছে তা পুষিয়ে নেয়া। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে নিজেকে ভালোভাবে গড়ে তোলা। অন্য যে কাবোর চেয়ে নিজের আত্মাকে আরও বেশি পরিশুদ্ধ করে নেওয়া। অগ্রজদের মনে রাখা চতুর্থ পদক্ষেপ হলো-সালাফদের কথা স্মরণ করা। যাতে কবে সালাফদের আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন, তাঁদের সাথে নিজের তুলনা করতে পারেন। আর এটা আপনার মনে এমন অনুভূতির সৃষ্টি করবে-যা আপনাকে তাঁদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ

করবে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে।" (সূরাহ আলে ইমরান ৩: ১৩৩) তিনি আরো বলেন, "তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমার আশায়।" (সূরাহ আল হাদিদ ৫৭: ২১)

এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।” (সূরাহ আল মুতাফফিফিন ৮৩:২৬) হ্যাঁ, জান্নাতের বিভিন্ন স্তরের জন্য আপনাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে। আল্লাহর প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য জ্বালানি স্বরূপ। এটাই আপনাকে খুশি মনে আগ্রহ নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করতে উদ্বুদ্ধ করবে। যখন ইবাদাতের প্রতি আগ্রহ কমে যায়, অন্তরে আল্লাহর প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা কমে যায়, তখন আপনার চূড়ান্ত গন্তব্যের (জান্নাতের) কথা স্মরণ করুন। আর এই গন্তব্য তো সেই সকল মুমিনের, যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহর উপর আশা আর আকাঙ্ক্ষা রাখে।

আল্লাহর রাসূলের একটি হাদিস, এ হাদিসটি আপনার মনে গেঁথে রাখুন। আপনার কম্পিউটারের সামনে, আপনার বাসায়, আপনার রুমে লাগিয়ে রাখুন। মোট কথা এই হাসিদটি কখনো যেন অন্তর থেকে মুছে না যায়। সহিহ মুসলিমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের বলবেন, তোমরা কি আমার কাছে আবো কিছু চাও?" তখন তারা বলবে, "আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে দেননি?" "আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি?" যদিও জান্নাতে সবাই আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ থাকবে। আল্লাহ বলেন, "এদিন জান্নাতবাসীরা আনন্দে মগ্ন থাকবে।” (সূরাহ ইয়াসিন ৩৬: ৫৫)

কিন্তু তারপরও জান্নাতীরা সেদিন এর চেয়েও বেশি কিছু পাবে। আল্লাহ সেদিন তাঁদের চোখের উপর থেকে পর্দা তুলে নেবেন আর আল্লাহর বান্দারা সেদিন তাদের রবকে নিজের চোখে দেখতে পাবে। আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার তুলনায় তারা এ পর্যন্ত যা যা পেয়েছে, সবকিছু ভুলে যাবে। [৯]

সুতরাং আল্লাহর উপর আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখুন। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করুন, জান্নাতে আল্লাহকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করুন, জান্নাতুল ফিরদাউসের আকাঙ্ক্ষা রাখুন। এই রামাদানে আপনার লক্ষ্য হবে আল্লাহর সিংহাসন যেন জান্নাতে আপনার ছাদ হয়, আপনার ছাদের উপর যেন আল্লাহর সিংহাসন থাকে। আপনি যেন ওয়াসিলার সবচেয়ে নিকটে থাকেন। আপনি যেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, খালিদ, আবু উবায়দাহ, আইশা, খাদিজা, উম্মে সালামা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের প্রতিবেশী হন। এইভাবেই আপনি আল্লাহর প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্জন করুন। তবে এই পথটা মোটেই সহজ নয়। আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত করার সময় আপনার সামনে অন্তরের অনেক ফিতনাহ এসে উপস্থিত হবে। চাকরি, সামাজিক প্রতিপত্তি, ধনসম্পদ, সন্তান, জীবনসঙ্গী-একের পর এক ফিতনা আসতেই থাকবে। এর মধ্যে কিছু আপনাকে আনন্দিত করবে, ধোঁকায় ফেলে দেবে। তাই এগুলোকে আপনার জন্য ফিতনাহ হতে দেবেন না, জান্নাতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেবেন না।

[৯] সহিহ মুসলিম: ৪৬৭

রামাদানের প্রস্তুতি

যেকোন প্রচেষ্টায় সফলতার জন্য প্রায়ই লোকজনকে বারবার আওড়ে যাওয়া কিছু উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। হোক সেটা ধর্মীয় কিংবা অন্য কোন পথের প্রচেষ্টা, উপদেশগুলো একই থাকে। এরকমই একটা উপদেশ হল আগেভাগে প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

মুসাফির তার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়, ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কাজের চাহিদা মেটাতে চাকরিজীবিরাও লাগাতার নানা প্রফেশনাল কোর্স করে থাকেন। অর্থাৎ, কোন কাজে সফল হওয়ার জন্য ভাল প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

রামাদান মাস যেন আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। এইতো অল্প কিছুদিন পরেই রামাদান। এক্ষেত্রেও অতি অবশ্যই সেই মূলনীতির কোন ব্যতিক্রম হবে না, যেখানে বলা হচ্ছে যে, "প্রস্তুতিই হচ্ছে সাফল্যের চাবিকাঠি।"

প্রতি বছরই রামাদানকে ঘিরে নেওয়া হয় হরেক রকমের প্রস্তুতি। এর মধ্য থেকে তিনটার কথা বলা যায়:

- ✔ রামাদানকে ঘিরে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার প্রস্তুতি।
- ✔ দুনিয়াদারদের রামাদানকেন্দ্রিক প্রস্তুতি।
- ✔ ঈমানদারদের রামাদান প্রস্তুতি।

রামাদানকে ঘিরে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার প্রস্তুতি

পাঁচটি উপায়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য রামাদানকে প্রস্তুত করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইসলামের এই মাসটাকে এতো বেশি পুরস্কার আর সুযোগ দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন যে আর কোন মাসকে তেমনটা রাখেন নি।

এক

আল্লাহ এটিকে করেছেন সামান্য কয়েক দিনের ব্যাপার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

| "সীমিত কয়েকটা দিন মাত্র।" ১।

এটা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে আমাদের উপর অসীম, অপার অনুগ্রহ যে মাত্র কয়েকটি 'লিমিটেড' দিনের মধ্যেই তিনি আমাদেরকে 'আনলিমিটেড', অফুরন্ত পুরস্কার দিতে চান।

দুই

ইনসানের সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু শয়তানকে এসময় রাখা হয় বন্দীদশায়। বামাদানে শয়তান শিকলবদ্ধ থাকে। রামাদানের একেবারে প্রথম দিন থেকে নিয়ে শেষ দিনটি পর্যন্ত চলে তার এই বন্দীত্ব, যাতে করে বছরের অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে এই সময়টাকে, ইবাদতের এই মৌসুমকে করে দেওয়া যায় ঈমানদারদের অন্তরের জন্য সহজতর আর হালকা।

বাসূলুল্লাহ বলেন- "যখন রামাদানের প্রথম রাতটি আসে, তখন শয়তান এবং বিদ্রোহী জ্বিনদেরকে শিকলবন্দী করে ফেলা হয়।" খি

তিন

একই হাদিসে রাসূলুল্লাহ বলেন, আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং একটা দরজাও খোলা থাকে না। ওদিকে জান্নাতের সবগুলো দরজা খুলে দেওয়া হয় আর একটা দরজাও বন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে না।"

চার

এই অসাধারণ মাসটির প্রত্যেক রাতে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু মুক্ত করে দেন

[১] সুরা বাকারাহ, আয়াত-ক্রম ১৮৪

[২] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম: ৬৮২

[৩] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম: ৬৮২

এমন অসংখ্য বনী আদমকে, জাহান্নামকেই যাদের জন্য জন্য ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল ঠিকানা হিসেবে।

রাসূলুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ এ মাসের প্রতি বাতে অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। "মি

পাঁচ

আল্লাহ এই মাসে এমন ভরপুর একটা রাত রেখেছেন যে রাত আল্লাহর দাসত্বে কাটিয়ে দেওয়াটা হাজার মাস আল্লাহর দাসত্ব করার চেয়েও বেশি। হাজার মাস মানে হল তিরাশি বছর চার মাস প্রায়। কিন্তু সেই রাতটায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে "হাজারটা মাসের চেয়েও বেশি" পুরস্কাবের হাতছানি।

রাসূলুল্লাহ বলেন, "রামাদানে এমন একটি রাত রয়েছে, যে রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এবং যে এই রাতের ফযিলত থেকে বঞ্চিত হল সে যেন সবকিছু থেকেই বঞ্চিত হল।" এ

এটা হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য প্রস্তুতির মধ্যে হাতেগোণা কয়েকটা মাত্র। কেন আল্লাহর এই বিরাট প্রস্তুতি? কারণ যারা চায় জান্নাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে, যারা চায় এব সুবিশাল বাগানগুলোতে ঘুরে বেড়াতে, যারা চায় জান্নাতের সবচেয়ে মূল্যবান উপহারগুলো পেতে এবং যারা চায় তাঁদের রব আল্লাহর কাছে, একেবারে কাছে একটা ঘরের মালিক হতে, সেই তাদের জন্য আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা এই মাসকে বানাতে চান একটা "পারফেক্ট ওপেনিং", এক শুভ সূচনা।

দুনিয়াদারাদব রামাদানাকন্দ্রিক প্রস্তুতি

আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা ইহসানের বদলা ইহসান দিয়ে দিতে চায় না। এরাই হচ্ছে দুনিয়াদার লোকজন, যারা দুনিয়াতেই ঘরবাড়ি বানানোকে তাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। তারা কিভাবে রামাদানের জন্য প্রস্তুত হয়? এমন

[১] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম ৬৮৯

[২] ইবনু মাজাহ, হাদিস ক্রম। ১৬৪৪

এক ভাবে তারা তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে, যার মাধ্যমে রামাদানের উপহারের পুরোটুকু না হলেও অধিকাংশই তারা স্রেফ হারিয়ে বসে।

দুনিয়াদার লোকেরাও রামাদানের প্রস্তুতি নেয় পাঁচভাবে:

এক

এদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ফ্রিজের ভেতর খাবার স্তুপ করে রাখার মধ্যে। যেন তারা "মান্থ অব ফাস্টিং"- "সাওমের মাস" পালনের পরিবর্তে "মান্থ অব ফিস্টিং" "ভোজনের মাস" উদযাপন করতে যাচ্ছে। আমরা কাফিরদের বলে থাকি এই মাস আমাদের ডায়েট ঠিক রাখতে, পরিমিত খাবার দাবার গ্রহণ করতে আর আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতেও সাহায্য করে। আর যখন এই কথাগুলো সত্য, তখন আমাদের খাবারের জন্য বেহিসাব প্রস্তুতি, যার ফল দাঁড়ায় ধাবাবাহিক ওজন বৃদ্ধি আর খাবারের ভয়াবহ অপচয়, আমাদের কথার সাথে এগুলো পুরোপুরি সাংঘর্ষিক হয়ে যায়।

এছাড়াও আমাদের অতিরিক্ত চাহিদা আমাদের স্ত্রীদের সময়কে নষ্ট করে ফেলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা অন্তহীন সময় ধরে নানা পদের খাবার তৈরিতে তাদের সময় ব্যয় করেন, যখন কিনা তাদের উচিত ছিল প্রভুর ইবাদাতে বেশি সময় ব্যয় করা। খেয়াল করে দেখুন রামাদানে আপনি কিভাবে খানাপিনা করেন।

রাসূলুল্লাহ বলেন, "দুনিয়াতে যাদের পেটগুলো পরিপূর্ণ থাকবে কিয়ামতের দিনে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত থাকবে।"

এই হাদীস শোনার পর এর বর্ণনাকারী আবু যুহাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ইন্তিকালের দিন পর্যন্ত আর কখনো পেট ভরে খাওয়া দাওয়া করেন নি।।খ

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "পেট মোটা কোন মানুষের কি অন্তর নরম হতে পারে?" ইমাম আহমাদ জবাব দিয়েছিলেন, "আমি এটা বিশ্বাস করি না।"

[১] আল জামিউস সাগির, হাদিস-ক্রম: ২২১১

[২] আল মুজামুল আউসাত লিত তাবারানি, হাদিস-ক্রম ৮/৩৭৮

দুই

রামাদান যত ঘনিয়ে আসে দুনিয়াদারদের চেহারায় নাখুশি আর বিরক্তির। চিহ্নগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের মুখের হাবভাব আর কথাবার্তা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ আমাদের সবাইকেই খুব ভালো করে জানেন। রামাদানে এমন কিছু মানুষ সিয়াম পালন করে যাদের সিয়াম পালনের একমাত্র কারণ হল তাদের আশেপাশের লোকজনের সিয়াম পালন করা। তারা অধীর হয়ে অপেক্ষা করে। যে কখন রামাদান মাস শেষ হবে। এ ধরণের লোকেরা এই ভয় করে না যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বলবেন: "তোমার উপবাস থাকার কোন দরকার আমার নেই! তুমি আমার

ইবাদাতকে ঘৃণা করতে এবং তাই আজকের দিনে আমার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।"

এই যে রামাদানের প্রতি এই বিতৃষ্ণা অথবা ইসলামের যেকোন বিষয়ের প্রতিই ঘৃণা, এসব একজন মানুষের আখিরাতকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। আল্লাহ এই ধরণের লোকদের সম্পর্কে বলছেন:

(ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। কাজেই তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে। দিয়েছেন।" ।১৯

তিন

রামাদানের জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে তারা অধীনস্তদের কর্মঘণ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা এজন্য করে না যাতে করে তাদের অধীনস্তরা ইবাদাত আর কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সময় পায়। এই কাজটা তারা করে সাওম পালনের সময় তাদের ঘুমানোর সুযোগকে সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়িয়ে তোলার জন্য।

চার

আগে থেকেই তারা ঠিক করে বাখে যে না খেয়ে থাকার সময়টুকু তারা কোন কোন টিভি সিরিজ দেখে কাটাবে। রামাদানের জন্য ব্যতিক্রম হিসেবে তারা [১] সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত-ক্রম ৯

নব্বই মিনিটের ফুটবল ম্যাচ পুরোটুকুই দেখে, শুধু হাইলাইটস দেখে সন্তুষ্ট থাকে না। তাদের কাছে সময় নষ্ট করাটাই সবচেয়ে জরুরি। এরচেয়েও খারাপ কাজ করে সেই মানুষগুলো যারা ইফতারের পরে এমন লোকদের সাথে মেশে বা এমন জায়গায় যায় যাদের সাথে থাকলে বা যেসব জায়গায় গেলে আল্লাহর অবাধ্যতা হয় আর এর মাধ্যমে সাওম পালনের মাধ্যমে যেটুকু সাওয়াব তারা অর্জন করেছিল, সেটুকুও একেবারে খুইয়ে বসে।

পাঁচ.

দুনিয়াদার লোকেরা এমন সব মসজিদ খুঁজে নেয় যেগুলোতে সবচেয়ে সংক্ষিপ্তাকারে তারাবীহর সালাত আদায় করা হয়। তাদের এমন করার কারণ এজন্য না যে পরেরদিন তাদেরকে সকাল সকাল উঠে কাজে যেতে হবে, বরং সালাত তাদের কাছে বোঝার মত মনে হয়। এটা বিস্ময়কর কিছু নয়, কারণ স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই বলেছেন,

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

|- "আর নিশ্চয় বিনয়ীরা। ছাড়া তা অন্যদের উপর কঠিন।" ।১।

এভাবেই দুনিয়াদারবা রামাদানের জন্য প্রস্তুতি নেয়। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ কীভাবে তাদের সাথে আচরণ করেন আর তারা কীভাবে আল্লাহর সাথে আচরণ করে, এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা করে দেখুন। আল্লাহ তাদের ডাকেন আর তারা সেই ডাক থেকে পালিয়ে যায়। আল্লাহ একটার পর একটা সুযোগের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন আর তারা সেটাকে দড়াম করে বন্ধ করে দেয়। তারা তাদের রবের সাথে এমন আচরণ করে যেন আল্লাহর তাদেরকে দরকার আর তাদের আল্লাহকে কোন দরকার নেই। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

ঈমানদারদের রামাদান প্রস্তুতি

ঈমানদারদের রামাদান প্রস্তুতি একেবারেই আলাদা। তাদের তো স্লোগান হয়, "ও রামাদান! জল্দি চলে এসো তুমি, আমাদের গুনাহগুলো তো বড় বেশি ভারী আর অন্তরগুলো তো বড়োই দুর্বল!" যেহেতু তারা জীবনকে আখিরাতের লেন্স দিয়ে দেখে, তাই তাদের প্রস্তুতি হয় উপরের লোকগুলো থেকে পুরো বিপরীত মেরুর। তাহলে কিভাবে তারা প্রস্তুতি নেয়?

(১) সূরা বাকারাহ, আয়াত-ক্রম: ৪৫

রামাদানের লক্ষ্য নির্ধারণ

রামাদান হচ্ছে এমন একটি মাস যা একজন মুসলিমের জীবনকে আমূল বদলে দেয়ার সামর্থ্য রাখে। অবশ্য তা হবে তখনই যখন আপনি রামাদান মাসকে রামাদানের মত করে কাটাতে পারবেন। আর তাই তো রামাদানের জন্য প্রস্তুতির পাশাপাশি এই মাসে আপনি কী কী আমল করবেন তার একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলা অত্যন্ত জরুরী। কারণ, আপনার সামনে যখন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে তখন তা পূরণের উদ্দেশ্যে আপনি মেহনত-মুজাহাদা করবেন এবং নিজেকে নিয়ে যেতে পারবেন অনন্য উচ্চতায়। গন্তব্য যখন স্পষ্ট থাকে তখন বন্ধুর পথের দুর্গম যাত্রাও অভিযাত্রী পাড়ি দিয়ে দেয় লক্ষ্যের পানে চেয়ে। আর লক্ষ্যহীন অভিযাত্রী একসময় হতাশ হয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। তাই লক্ষ্য নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ।

কেন লক্ষ্য নির্ধারণ করব?

আচ্ছা, রামাদানে লক্ষ্য নির্ধারণ করব না-ই বা কেন? রামাদানে যে এত এত সওয়াবের হাতছানি আমাদের সামনে তার কি হিসাব আছে?

নবীজি বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এই মাসে একটি নফল আমল করবে সে ওই ব্যক্তির সমান সওয়াব লাভ করবে যে অন্য মাসে একটি ফরজ আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরজ আদায় করলো সে ওই ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে, যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করলো।"।১

এখন চিন্তা করুন, রামাদানে সাধারণ একটি আমল করেও আপনি অন্য সময়ের আমলের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি সওয়াব পেয়ে যাবেন। আর রোজা রাখার সওয়াব তো আল্লাহর কাছে সারপ্রাইজ হিসেবে রয়েছে, কারণ আল্লাহ রোজা রাখার পুরস্কার ঘোষণা না করে সারপ্রাইজ হিসেবে আমাদের জন্য লুকিয়ে রেখেছেন

[১] আত তারগিব ওয়াত তারহিব, ২/১১৫

যা আমরা পরকালে দেখতে পারব, ইনশাআল্লাহ। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ পাক বলেন, "বান্দার সকল নেক আমলের সওয়াব দানের জন্য একটি নিয়ম বা স্কেল থাকে। প্রত্যেক নেক আমলের সওয়াব সেই অনুসারে দেয়া হয়। দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত। কিন্তু রোযার বিষয়টি সাধারণ স্কেল ও নীতির উর্ধ্বে। বান্দা আমার জন্যই খাদ্য-পানীয় বিসর্জন দিয়েছে, কামক্রিনয়া বর্জন করেছে, সুতরাং সরাসরি আমি নিজে তাকে বিশেষ আজর ও সওয়াব দান করবো।" ।১।

উপরের হাদিসে কুদসি থেকে লক্ষ্যণীয়

- ✔ প্রত্যেক নেক আমলের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে

- ✔ রোজার পুরস্কার আল্লাহ নিজে দিবেন

ইখলাস ও খুশুর উপর ভিত্তি করে আপনার ইবাদাতের সওয়াব সাতশ গুণ পর্যন্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আর রামাদানে এই সম্ভাবনা আরো বেশি। কারণ, শয়তানকে এ মাসে শিকলবদ্ধ করে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ বলেন, "যখন রমজান মাস আসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়।" ।২০

আরেকটি হাদিসে এসেছে, "জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায়কারী একাকী নামাজ পড়া অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদার অধিকারী।।৩)

এখন রামাদানে তিন রাকাত মাগরিবের সালাত জামাতের সাথে পড়লে কয়গুণ সওয়াব হবে হিসাব করে দেখি। তিন রাকাত নামাজ জামাতে পড়লে তা একাকী নামাজ অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদা পাবে। যেহেতু রামাদানের ফরয নামাজ তাই অন্য সময়ের

ফরয নামাজ অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশি সওয়াব নিয়ে আসবে। আর রামাদানে যেহেতু খুশু অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাই সাতশত গুণ সওয়াব বোনাস পাওয়ার ব্যাপারটিও ভুলে যাবেন না।

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম ১১৫১

(২) বুখারি, হাদিস-ক্রম ১৮৯৯; মুসলিম, হাদিস- ক্রম ১০৭৯ [৩] বুখারি, হাদিস-ক্রম ৬৪৫, মুসলিম, হাদিস-ক্রম ৬৫০

তাহলে রামাদানে ৩ রাকাত নামাজ পড়ে আপনি পেতে পারেন = ৭০*৭০০*২৭ = ১৩,২৩,০০০। অর্থাৎ, তের লক্ষেরও অধিক পরিমাণ সওয়াব আপনি শুধুমাত্র রামাদানে ৩ রাকাত মাগরিবের নামাজ জামাতের সাথে পড়েই পেয়ে যেতে পারেন।

আর উদাহারণ দিতে চাচ্ছি না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন, কেন রামাদানের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করব। আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ রামাদানের জন্য ছয় মাস প্রস্তুতি নিতেন আর রামাদানের পরের ছয় মাস এর সুফল ভোগ করতেন। তাদের সমগ্র বছরই থাকত রামাদানকেন্দ্রিক। আমাদেরও রামাদানের জন্য প্রাক-প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

"Three P"

শুধু রামাদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা যথেষ্ট নয়, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজে নেমে পড়তে হবে। যেকোন কাজেই সফল হতে হলে নিম্নে বর্ণিত ৩টি ধাপ অনুসরণ করে কাজটি করলে তাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে, আর তা রামাদান

মাসের লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও সত্য। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে এই বিধিকে "Three P' বলে। তা হচ্ছে-

১। পরিকল্পনা (Planning); অর্থাৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পন্থা যা লিখিত আকারে থাকলে ভাল হয়।

২। প্রস্তুতি (Preparing); লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা ও আবশ্যক জিনিসপত্র হাতের কাছে বাখা।

৩। অনুশীলন (Practicing), মূল প্রজেক্ট শুরু হওয়ার আগে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে কাজগুলো করতে হবে তা করার অনুশীলন শুরু করে দেয়া। রাসূলুল্লাহ শাবান মাসে যত নফল রোজা রাখতেন, তা অন্য মাসে সাধারণত রাখতেন না। তিনি সম্পূর্ণ শাবান মাসই রোজা রাখতেন। আর শাবান মাস হচ্ছে রামাদানের আগের মাস। ব্যাপারটাকে ভারোত্তোলনের সাথে তুলনা করা যায়। মনে করুন, আপনি রজব আর শাবান মাস থেকে ভারোত্তোলন করা শুরু করলেন। যখন রামাদান মাস আসবে আপনার জন্য কাজটি সহজতর

[১] বুখারি, হাদিস ক্রম ১৯৬৯, মুসলিম, হাদিস ক্রম ১১৫৬

হয়ে যাবে, আপনার প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যাবে; আর শয়তান শেকলবদ্ধ থাকায় ভারের পরিমাণও কমবে বৈকি!

তাই প্রোডাক্টিভ রামাদান পালন করতে চাইলে আগেভাগে পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও অনুশীলন শুরু করে দিতে হবে।

রামাদানে কী লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন?

শুধুমাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য সাধু-সন্যাসী হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ না করে এই রামাদানে এমন কিছু সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নির্ধারণ করুন যা আপনাকে সারাবছর ফায়দা দিবে। চেষ্টা করুন এমন কিছু ভাল অভ্যাস গড়ে তোলার যার দরুণ সারাবছরই লাভবান হওয়া যায়।

রামাদানের লক্ষ্য আসলে সবার একই বকম না হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের প্রত্যেকের কাজ, দায়িত্ব ও সক্ষমতা ভিন্ন। সবকিছু বিবেচনা করে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র লক্ষ্য হওয়াই অধিক বাস্তবসম্মত। তথাপি, নিচে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হল যা রামাদানের লক্ষ্য নির্ধারণে পাঠকদের জন্য সহায়ক হবে।

নামাজ-কেন্দ্রিক লক্ষ্য

ফরজ

দিনে পাঁচবার অবশ্যই ফরজ নামাজ পড়বেন। এটি অত্যাবশ্যক। মিস দেয়ার প্রশ্নই আসে না। আপনি যদি ফরজ নামাজে নিয়মিত না হয়ে থাকেন, তাহলে এখনই সময় সেই অভ্যাস গড়ে তোলার।

সুন্নত

যত বেশি সম্ভব সুন্নত নামাজ পড়ুন। চেষ্টা করুন, প্রতিদিন অন্তত বারো রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাজ (ফজরের ফরজ নামাজের আগে ২ রাকাত, যুহরের ফরজের আগে চার রাকাত, যুহরের ফরজের পর আরো ২ রাকাত, মাগরিবের ফরজের পর ২ রাকাত

এবং ইশার ফরজের পর ২ রাকাত সুন্নত নামাজ) যেন পড়তে পারেন। কারণ, তা করলে জান্নাতে একটি প্রাসাদ পুরস্কার পাবেন।

ইশরাক/দোহা

ফজরের পর সূর্য উঠার কিছু পরে এই নফল নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। এব অনেক ফযিলত রয়েছে। রামাদান মাস এই নামাজ নিয়মিত পড়ার অভ্যাস গঠন করার উপযুক্ত সময়।

তারাবিহ

তারাবিহর নামাজ বিনা রামাদান মাস কল্পনাও করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায়, অনেকে ইশার ফরজ নামাজ পড়েন না, কিন্তু তারাবিহ পড়েন। এমনটি করা কাম্য নয়। ইশার ফরজের মর্যাদা তারাবিহর নামাজ থেকে অনেক বেশি। চেষ্টা করবেন, ইশার ফরজ এবং তারাবিহর সম্পূর্ণ নামাজ মনোযোগের সাথে মসজিদে গিয়ে আদায় করতে। তারাবিহতে যে মসজিদে ধীরে ধীরে কিরাত পড়ানো হয় সেই মসজিদে তারাবিহর নামাজ পড়বেন। তারাবিহতে কুরআনের স্বাদ নেয়ার চেষ্টা করবেন। ভাল হয় যদি তারাবিহর নামাজে যাওয়ার আগে ওইদিন কুরআনের যে অংশটুকু পড়ানো হবে, তার তিলাওয়াত বাসা থেকে শুনে ও তরজমা পড়ে যেতে পারেন। তাহলে নামাজে খুশু আরো বেশি পাওয়া যাবে।

বিতির

নবীজি কখনো এই নামাজ ছাড়তেন না, এমনকি সফরে থাকলেও পড়ে নিতেন। রামাদানে সাধারণত তারাবিহর নামাজ শেষ হলে ইমাম সাহেব জামাতের সাথে বিতির পড়ান। অনেকে অবশ্য শেষ রাতে পড়ার জন্য বিতির নামাজ রেখে দেন।

তাহাজ্জুদ

তাহাজ্জুদ বা রাতের নামাজ হল এমন এক শক্তিশালী নফল ইবাদাত যা করার তাউফিক শুধুমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরই হয়ে থাকে। রামাদানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর পাওয়ার আশায় অনেকেই রাতে নফল তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেন। আপনি সমগ্র মাস জুড়ে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে পারেন। এতে

[১] যাদুল মাআদ, ১/৩১৩

বছরের বাকি সময়ও এই নামাজ পড়ার অভ্যাস চলে আসবে। আর তাহাজ্জুদের নামাজের তৃপ্তি একবার পেয়ে গেলে তা আপনি ছাড়তে চাইবেন না।

নফল

এছাড়াও যত বেশি সম্ভব নফল নামাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন। চেষ্টা করবেন, ফরজ নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে কাটানোর এবং মসজিদে বেশি সময় কাটানোর। রামাদানের শেষ দশদিন সুন্নত ইতিকাফ করার। চেষ্টা করবেন।

কুরআন-কেন্দ্রিক লক্ষ্য

আরবি ভাষায় কুরআন তিলাওয়াত করুন

সেই ভাষায় কুরআন পড়ুন যেই ভাষায় তা নাজিল হয়েছে। আরবিতে কুরআন তিলাওয়াত করার অসংখ্য বরকত ও ফজিলত রয়েছে, যদিওবা আপনি অর্থ না বুঝেন। হতে পারে, কুরআন পড়তে পড়তে আরবি ভাষা শেখার প্রতিও আপনি উৎসাহ অনুভব করবেন।

নিজের ভাষায় কুরআনের অনুবাদ পড়ুন

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল কুরআনের কথাগুলো অনুধাবন করা যাতে করে কুরআনের কথাগুলো আপনার হৃদয়ে আলোড়ন তুলে। আর সে জন্য যদি কুরআনের অনুবাদ পড়তে হয়, তবে আমি বলব সেদিকেও জোর দিবেন। এতে করে তারাবিহর নামাজেও কী তিলাওয়াত করা হচ্ছে তার কিছুটা আপনি বুঝতে পারবেন। তবে সবচেয়ে ভাল হবে যদি আপনি আরবি ভাষা শিখে ফেলেন। কারণ, একমাত্র তখনই আপনি কুরআনকে কুরআনের ভাষায় বুঝতে পারবেন।

তিলাওয়াত শুনুন

সবাবই পছন্দের কারি রয়েছে। (কাবি বলে যাদের কুরআন তিলাওয়াতে বিশেষ দক্ষতা রয়েছে) রামাদানে আপনি যত বেশি পারেন কুরআন তিলাওয়াত শুনার চেষ্টা করুন। আমি তো বামাদানে গাড়িতে করে অফিস যেতে যেতেই অন্তত তিলাওয়াত শুনার মাধ্যমে একবার কুরআন খতম দেয়ার চেষ্টা করি।

কুরআন মুখস্থ করুন এবং রিভিশন দিন

অনেকেই রামাদান ছাড়াও নিয়মিত কুরআনের কিছু না কিছু সূরা মুখস্থ করেন। তবে, রামাদান মাস হল কুরআন মুখস্থ করার সবচেয়ে উর্বর সময়। যত বেশি পারেন কিতাবুল্লাহর আয়াত মুখস্থ করুন এবং আগের মুখস্থ করা আয়াতগুলো পুনরায় ঝালিয়ে নিন। রামাদানে কুরআন নিয়ে যখন আপনার লক্ষ্য স্থির করবেন, তখন কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করার জন্যেও স্থির করে রাখবেন।

অন্যান্য ইবাদাতকেন্দ্রিক লক্ষ্য

ইতিকাফ

রামাদানের শেষ দশদিন নবীজি মসজিদে টানা ইতিকাফ করতেন।।" সুন্নত ইতিকাফ এমন এক বিশেষ ইবাদাত যা শুধুমাত্র রামাদানেই করা হয়। তাই রামাদানে এই আমলটি করার সুযোগ গ্রহণ করুন। রামাদানের শেষ দশদিন মসজিদে অবস্থান করে ইতিকাফ করুন। এই শেষ দশদিনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে হাজার বাত্রি অপেক্ষা উত্তম রাত্রি, লাইলাতুল কাদর। রামাদানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করলে অন্তত এতটুকু নিশ্চিত যে, লাইলাতুল কাদর আপনার মিস হবে না, এমনকি আপনি যদি মসজিদের ভেতর ঘুমিয়েও থাকেন তবু আপনার আমলনামায় ইবাদাতের সওয়াব লিখিত হবে।

দুআ

সূরা বাকারা'র ১৮৩ নম্বর আয়াত থেকে আল্লাহ রামাদানের বিধান বর্ণনা করেছেন। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, রামাদান নিয়ে আলোচনার মাঝে হঠাৎ আল্লাহ এমন এক আয়াত বর্ণনা করলেন যা বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে।

আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম ২০২৬; মুসলিম, হাদিস-ক্রম ১১৭২

يَرْشُدُونَ .

"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।"

এই আয়াতে দুআর কথা বলা হয়েছে। অথচ এই আয়াতের আগের ও পরের আয়াতে ধারাবাহিকভাবে রামাদান নিয়ে আলোচনা এসেছে। এ থেকে রামাদানের সাথে দুআর সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। রামাদান হল দুআর মাস, দুআ কবুলের মাস। এ মাসে দুআ কবুলের জন্য অনেক সুবর্ণ সময় রয়েছে। সাহরির সময়, শেষরাতে, ইফতারের সময়, ফরজ নামাজের আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় দুআ কবুলের বিশেষ কিছু সময়। তাই রামাদানে নিয়মিত করবেন এমন কিছু মাসনুন দুআ শর্টলিস্ট করে নিন এবং নিয়মিত প্রতিদিন দুআ করুন। রামাদানে আপনি প্রতিদিন নূন্যতম কিছু সময় দুআ করার চেষ্টা করবেন। প্রিয় মাসনূন দুআগুলো মুখস্থ করে নেয়ার পরিকল্পনা করে নিতে পারেন। বর্তমানে অনেক ভাল ভাল দুআ সংকলনের নির্ভরযোগ্য বই বাজারে পাওয়া যায়। আপনি যেকোন একটি বই কিনে গুরুত্বপূর্ণ দুআগুলো দাগিয়ে রাখতে পারেন, অর্থসহ পড়তে পারেন এবং মুখস্থও করতে পারেন। মাসনূন দুআর অনুবাদ পড়া আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি কাজ। নবীজির দুআর ভাষা পড়লে আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কের গভীরতা অনুভব করা যায় ও ঈমান মজবুত হয়।

এছাড়া, আপনি আল্লাহর কাছে নিজের জন্য যেসব হালাল জিনিস চান তার লিস্ট বানিয়ে নিতে পারেন। প্রিয়জনদের জন্য যা যা দুআ করবেন তাও লিখে নিবেন। আমরা যখন দুআর জন্য হাত উঠাই, তখন মাঝপথে এসে খেই হারিয়ে ফেলি। অনেক কিছু চাওয়ার বাকি থাকে, কিন্তু কী দুআ করব তৎক্ষণাৎ মাথায় আসে না। একবার ইতিকাফরত অবস্থায় দেখলাম মসজিদে একজন মুসল্লি এসে দীর্ঘ সময় দুআ করছেন। এটি ছিল উনার নিয়মিত আমল। অথচ, আমি অল্প

(১) সূরা বাকারাহ, আয়াত-ক্রম ১৮৬

সময়ও দুআ করতে পারিনা। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমি কী দুআ করব তা মোবাইলের নোটপ্যাডে লিখে রাখা শুরু করলাম আর অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, দুআতে আমার অনেক জিনিস মনে হচ্ছে যা আমি এর আগে হয়ত ভুলে যেতাম।

যিকির

যিকির বা আল্লাহর স্মরণ হলো আত্মিক শক্তির এক বিরাট উৎস। এটি যে কোন রূপে হতে পারে- আল্লাহর প্রশংসা করা, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা, কোন কাজ শুরুর আগে তাঁর নামে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি। অনেক ধরনের যিকির রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যার যিকির, ঘুমানোর আগের যিকিব, ঘুম থেকে উঠার পরের যিকির, ইস্তিগফার, তাসবিহ ইত্যাদি।

রামাদানে আপনার জবানকে সর্বদা যিকিরের মাধ্যমে সিক্ত রাখুন। যখন জ্যামে আটকে বসে থাকবেন, তখন যিকির করতে থাকুন। কাজের ফাঁকে হালকা সময় বের করতে পারলে তখন যিকির করুন। এভাবে সময় পেলেই যিকির করুন। বিশেষ করে, যারা

অনেক ব্যস্ত শিডিউলে থাকেন তারা যদি যিকিরের অভ্যাস রপ্ত করে নিতে পারেন, তাহলে রামাদানে কত্ত বেশি সওয়াব হাসিল করে নিবেন তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

যিকিরের সময় শুধু জবানে নয়, অন্তরে ও চিন্তায়ও যিকির জারি রাখবেন, যিকিরের শব্দগুলো মন থেকে বলার চেষ্টা করবেন। কী কী যিকির করবেন ও কোন যিকিরের কী ফযিলত তা জানতে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো পড়ুন।

তাফাকুর

তাফাকুর অর্থ হচ্ছে চিন্তাভাবনা করা, উপলব্ধি করা। আল্লাহর বড়ত্ব, কুদরত ও সৃষ্টির রূপবৈচিত্র্য নিয়ে চিন্তা করা, স্রষ্টার সুনিপুণ ক্ষমতার কথা চিন্তা করা হচ্ছে তাফাকুর। রামাদানে ইতিকাফের সময় যদি আপনি বেশি বেশি তাফাকুর করতে পারেন তাহলে তা হবে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করার চেয়েও বেশি অসাধারণ ব্যাপার।

দাওয়াহ ইলাল্লাহ

রামাদান মাসে হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য অমুসলিমদের কাছে প্রচার করার ও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ। কারণ, এ মাসে অমুসলিমরা ইসলামের অপরিসীম সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রত্যক্ষ করতে পারে। বিশেষত, যারা অমুসলিম দেশে বসবাস করেন তারা রামাদান মাসকে দাওয়াহর কাজে ভালভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

সামাজিক লক্ষ্য

সন্দেহাতীতভাবে, রামাদান হচ্ছে অসাধারণ এক সামাজিক অভিজ্ঞতা। জামাতবদ্ধ হয়ে মসজিদে নামাজ পড়া, তারাবিহ পড়া, একসাথে ইফতার করা- মুসলিমদের সামাজিক ভাতৃত্ববোধ এ মাসে যেন তুঙ্গে থাকে। এ মাসে আপনিও আশেপাশের মুসলিমদের সাথে নিজের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করুন। পাশাপাশি, পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে ইফতার করতে বসুন।

শারীরিক লক্ষ্য

হাইড্রেশন

রামাদান মাস যদি গ্রীষ্মকালে হয় তবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শরীরের পানির চাহিদা পূরণ করা। যেহেতু দিন অনেক লম্বা হয়, তাই শরীরে পানিশূন্যতা অনুভূত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

উপরন্তু, ইফতারের পর থেকে সাহরি পর্যন্ত সময় খুব বেশি নয়। দেখা

যায়, অনেকেই সারাদিন এত বেশি ক্ষুধার্ত থাকেন যে ইফতারে গলা পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া করেন। এরপর আর পানি খাওয়ার মত জায়গা অবশিষ্ট থাকে না। ফলশ্রুতিতে পরের দিন তারা অনেক বেশি পানিশূন্যতায় ভুগেন, তৃষ্ণার্ত অনুভব করেন। রামাদানে প্রতিদিন কতটুকু পানি পান করবেন তাঁর একটা লক্ষা নির্ধারণ করে নিন। লক্ষ্য পূরণের জন্য রাতে যেখানেই যান না কেন, সাথে এক বোতল পানি বাখবেন। আমি সাধারণত ইফতারে খুব বেশি পানি খাই না কারণ, ইফতারে অধিক পানি পান করলে আমার তারাবিহতে ঘুম চলে আসে। আমি তারাবিহতে যাওয়ার সময় এক বোতল পানি নিয়ে

যাই এবং কিছুক্ষণ পর পর পানি পান করি। এভাবে সাহরির সময় পর্যন্ত নিয়মিত বিরতিতে পানি পান করি।

বিশ্রাম

দীর্ঘ সিয়াম আপনাকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করে দিতে পারে, বিশেষ করে আপনি যদি পানিশূন্যতায় ভুগেন। রামাদানে প্রতিদিন কত ঘন্টা বিশ্রাম করবেন সেই টার্গেটও নির্ধারণ করে রাখুন। দিন-রাত মিলিয়ে প্রতিদিন কয় ঘণ্টা ঘুমাবেন তা নির্দিষ্ট করুন। রাতে ঘুমাতে না পারলে দিনে সময় সুযোগমত হালকা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

খাদ্যাভ্যাস

রামাদানে আপনার খাদ্যাভ্যাসের উপর নির্ভর করবে দিনভর আপনার শরীর কতটুকু শক্তিশালী থাকবে এবং আপনি কতটুকু প্রোডাক্টিভ থাকতে পারবেন। ইফতারে স্বাস্থ্যকর খাবার খাবেন। অতিরিক্ত পরিমাণে তৈলাক্ত খাবার খাবেন না।

সহায়ক খাদ্য

বামাদানে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ভিটামিনের যোগান দেয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। তাই পুষ্টিচাহিদা পূরণ করতে ডাক্তাবের সাথে পরামর্শ করে ভিটামিন সাপ্লিমেন্টেশন খাওয়া যেতে পারে। আমি রামাদানে এনার্জি বুস্টার হিসেবে তাজা ফলের জুস খেতে পছন্দ করি। এটি আপনাকে অল্প সময়ে অনেক পুষ্টি ও শক্তির যোগান দিবে।

ফিটনেস

রামাদানে রাতে অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের কারণে অনেকের ওজন বেড়ে যায়। অনেক মুসলিমই দিনে চলাফেরা কমিয়ে দেন। ফলে ফিটনেসে প্রভাব পড়ে। রামাদানেও

ব্যায়াম করা চালিয়ে যাওয়া উচিত। প্রতিদিন ব্যায়ামের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে অল্প হলেও কিছু পরিমাণ সময় ব্যায়াম করা উচিত। এটি দেহ ও মনের জন্য উপকারী। অনেকে তারাবিহর পর ঘুমানোর আগে হালকা ব্যায়াম করেন। কেউ কেউ ফজরের পর হালকা ব্যায়াম করেন। আপনি আপনার পছন্দসই একটি সময় বেছে নিতে পারেন এবং ফিটনেসের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য আগে থেকে ঠিক করে রাখতে পারেন।

একটি সফল রামাদান পরিকল্পনা

রামাদানের জন্য পরিকল্পনা করা, ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং এতে সফল। হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। রামাদানে আপনার লক্ষ্যগুলো হতে হবে সুবিন্যস্ত। ও স্পষ্ট। আর তাহলেই আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। সুবিন্যস্ত। লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হলে আপনাকে নিচের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করে। নিজের লক্ষ্যগুলোকে পুনর্বিবেচনা করে নিতে হবে।

ইতিবাচক লক্ষ্য

অনেক লোকের ইচ্ছা থাকে যে রামাদানে নিজের কোন নেতিবাচক অভ্যাস বা জীবন থেকে নেতিবাচক কিছু ঝেড়ে ফেলার। এটি হতে পারে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেয়ার লক্ষ্য কিংবা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্য। কিন্তু আমি আপনাকে ভিন্ন কথা বলব। রামাদানে কোন অভ্যাস ত্যাগ করার বা পরিবর্তন করার লক্ষ্যের চেয়ে আমাদের বেশি জোর দেয়া উচিত নতুন অভ্যাস গঠন করার লক্ষ্যের প্রতি। আপনার মন সেইদিকেই আকৃষ্ট হবে যা নিয়ে আপনি চিন্তা করছেন। তাই যখন আপনার লক্ষ্যের কথা আপনি নেতিবাচক ভঙ্গিতে লিখবেন তখন আপনার মন তা করার প্রতিই বেশি আগ্রহী হয়ে যাবে। সুতরাং, লিখবেন না, "বামাদানে আমার ওজন ২০ কেজি কমাতে হবে"; বরং লিখুন, "বামাদানের শেষে আমার ওজন ৭০ কেজিতে নিয়ে আসতে হবে।" একইভাবে আপনি যদি লিখেন, "এই রামাদানে কুরআন খতম দিতে ব্যর্থ হলে চলবে না", তাহলে তা আপনার মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বরং, লিখুন, "এই রামাদানে কুরআন খতম করতে হবে।"

প্রাসঙ্গিক লক্ষ্য

রামাদান নিয়ে আপনার লক্ষ্য হতে হবে প্রাসঙ্গিক। রামাদান আসলে আলিমরাও তাদের ফিকহু হাদিসের কিতাবাদি ঘুচিয়ে কুরআন পড়তে মনোনিবেশ করতেন। আপনার

রামাদানের লক্ষ। এমন কিছু হতে হবে যা রামাদান মাসের সাথে প্রাসঙ্গিক হয়। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, স্ব-প্রণোদিত হয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন। কারো কথায় আকৃষ্ট না হয়ে নিজের তাড়না থেকে লক্ষ্য নির্ধারণ করলে তাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে।

নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার টার্গেট রাখুন

আমরা সাধারণত এমন সব লক্ষ্য নির্ধারণ করি যা আমাদের পক্ষে পূরণ করা সহজেই সম্ভব। তবে রামাদানে এমন করবেন না। একটু কঠিন লক্ষ্য নির্ধারণ করুন যা দেখে আপনি একটু হলেও নার্ভাস হবেন। জীবনে আগে কখনো রামাদানের প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ পড়েন নি? প্রতিদিন ইশার নামাজের পর সম্পূর্ণ তারাবিহর নামাজ পড়েন নি? আগে কখনও ইতিকাফ করেন নি? - তাহলে এখনই সময়। রামাদানে আপনার জন্য এ কাজগুলো করা সহজ, কারণ শয়তান শেকলবদ্ধ থাকে, চারিদিকে প্রবাহমান থাকে রামাদানের সুশীতল বাতাস। তাছাড়া আমলের ফজিলতও তো অনেক বেশি। নবীজি রামাদানের শেষ দশকে নিজের কোমরবন্ধ শক্ত করে বেঁধে নিতেন এবং বামাদানের আগের বিশ দিন যে পরিমাণ ইবাদাত করতেন, শেষ দশ দিন তার পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিতেন। আমাদেরও এভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার টার্গেট রাখতে হবে।

সংখ্যাবাচক লক্ষ্য

মনে করুন, রামাদানে আপনি একবার সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করার লক্ষ্যস্থির করলেন। তাহলে, প্রতিদিন এক জুয অর্থাৎ প্রায় ২০ পাতা তিলাওয়াত করতে হবে। তাহলে, আপনি দিনে ১০ পাতা আর রাতে ১০ পাতা তিলাওয়াত করার লক্ষ্য নির্ধারণ

করতে পারেন। অথবা, প্রত্যেক ফরয নামাজের পর ৪ পাতা করে পড়তে পারেন। এভাবে সংখ্যাবাচক লক্ষ্য নির্ধারণ করলে তা পূরণ করা সহজতর হবে।

পর্যালোচনা

রামাদানে আপনার লক্ষ্য অনুযায়ী কতটুকু পূরণ করতে পারছেন তা প্রতিদিন হিসাব নিতে হবে, আত্মপর্যালোচনা করতে হবে। তাহলে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন কোথায় সমস্যা হচ্ছে এবং কোথায় আরো বেশি চেষ্টা চালাতে হবে। ইসলামি পরিভাষায় আত্মপর্যালোচনাকে মুহাসাবা বলে। হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"বুমিন তার নিজের অভিভাবক। সে নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ করে। যারা দুনিয়াতে মুহাসাবা করেছে, আপন কৃতকর্মের হিসাব নিয়েছে, কিয়ামতের দিন তাদের হিসাব সহজ হবে। আর যারা মুহাসাবা ছাড়া জীবনযাপন করেছে, তাদের হিসাব কঠিন হবে।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল লক্ষ্য নির্দিষ্ট হওয়া। যেমন, আপনি রামাদানে আপনার চরিত্র সুন্দর করতে চান। তা কীভাবে করবেন? কার সাথে করবেন? চরিত্রের কোন কোন দিকগুলো সুন্দর করবেন। কোন কোন দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবেন এধবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখতে হবে।

এজেন্ডা

আপনি চাইলে রামাদানে ১০০টি লক্ষ্য রাখতে পারেন। কিন্তু, আপনার হাতে পর্যাপ্ত সময় না থাকলে তো আপনি তা পূরণ করতে পারবেন না। তাই এদিকেও খেয়াল

রাখতে হবে। আপনি প্রতিদিন ২০ পাতা কুরআন পড়বেন, ভালো কথা। এখন আপনি হিসাব করুন ১ পাতা তিলাওয়াত করতে আপনার কত সময় লাগে। এভাবে পরিকল্পনা করে নিতে হবে যে প্রতিদিন আপনার তিলাওয়াতে কত সময় দিতে হবে।

লজ্জাগুলো সব লিখে রাখুন

উপবে আমরা সংক্ষিপ্ত দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করেছি। এখন আপনি ৩০ মিনিট সময় ব্যয় করে এই রামাদানে আপনার নিজের জন্য ১৫টি লক্ষ্য নির্ধারণ কবে তা লিখে রাখুন। তারপর কীভাবে আপনি এই লক্ষ্যগুলো পূরণ করবেন তা নিয়ে চিন্তা ফিকির করুন।

ব্যক্তিসত্তা

লক্ষ্য সম্পর্কে লেখার সময় নিজের ব্যক্তিসত্তাকে উদ্দেশ্য করে লিখবেন। সম্পূর্ণ বাক্যে নিজের লক্ষ্য লিখবেন এবং সরাসরি নিজেকে উদ্দেশ্য কবে লিখবেন।

[১] হিলযাতুল আউলিয়া,

২/১৫৭

যেমন, "প্রতিদিন ৪৫ মিনিট কুরআন পড়া" না লিখে লিখবেন- "আমি প্রতিদিন ৪৫ মিনিট কুরআন পড়ব"।

বর্তমান কাল

এটি হচ্ছে আরেকটি দারুণ কৌশল। লক্ষ্যগুলো ভবিষ্যৎ কালে না লিখে বর্তমান কালে লিখুন। লক্ষ্য সম্পর্কে লেখার সময় ভাবুন যদি সেই লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে যেত, তাহলে আপনি কী লিখতেন এবং সেই কথাই লক্ষ্যের জায়গায় লিখে ফেলুন। যেমন, "এই রামাদানে ১০টি সূরা মুখস্থ করব" না লিখে আপনি লিখুনঃ "আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে এই রামাদান শেষে আমি ১০টি সূরা মুখস্থ করে ফেলেছি।" এভাবে লিখলে যতবারই আপনি আপনার লক্ষ্যগুলো পড়বেন ততবার আপনি অনুভব করবেন যে এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারলে আপনার কত ভাল লাগবে। নিঃসন্দেহে এই কৌশল আপনাকে লক্ষ্য পূরণে অনুপ্রাণিত করবে।

মনছবি

আমাদের মন লেখার শব্দ দেখে না, বরং ছবি দেখে। তাই মনের চোখ দিয়ে আপনার লক্ষ্যপূরণের মুহূর্তটি কল্পনা করুন। এটিও আপনাকে লক্ষ্যপূরণে প্রেরণা জোগাবে ইনশাআল্লাহ।

যেভাবে রামাদানকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন

১। নিয়ত

আবু হুরায়বাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেন, "যে রামাদানের রাতগুলো ঈমান সহকারে ও পুরস্কারের আশায় সালাতের মধ্যে কাটাবে এবং যে কদরের রাত ঈমান সহকারে ও পুরস্কারের আশায় সালাতের মধ্যে কাটাবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"এস

এটা থেকে বুঝা যায় যে, কি করছি এবং কেন করছি, এই দুই বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি। এই হাদীস থেকে এটাই বুঝা যায় যে হৃদয় ও মন দুটোকেই সজাগ বাখা জরুরি। আল্লাহ দেখতে চান তাঁর বান্দারা পুরস্কারের আশায় উদগ্রীব হয়ে কাজ করে যাচ্ছে, উদ্দেশ্যহীনভাবে শুধু শারিরীক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে না।

একটি পরীক্ষিত পরামর্শ:

যদি আপনি আল্লাহর উপর ঈমান রেখে এবং তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার পাবার ও তাঁর ঘনিষ্ঠতা পাবার আশা রেখে আল্লাহর জন্য কোন কিছু আন্তরিকভাবে করতে চান, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ আপনার জন্য এই কাজকে সহজ করে দেবেন। এটা একেবারে সুনিশ্চিত। তাই যদি আপনি আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করেন এবং রামাদানের রাতগুলোতে ইবাদাত করার খাস নিয়ত রাখেন, তাহলে আল্লাহ নিজে আপনার জন্য সেই কাজকে সহজ করে দেবেন।

অতএব, প্রথমে আপনার অন্তরকে পরীক্ষা করে নিন। নিয়তকে নবায়ন করুন এবং জেনে রাখুন কেবলমাত্রই আল্লাহই আমাদের জন্য ইবাদাতকে সহজ করে দেন।

যেমনটা আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন-

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ২০১৪; মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ৭৬০

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ .

"নিশ্চয়ই আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই। [১]

তাহলে আশা ছেড়ে দেবার আর কোন সুযোগ এখন থাকলো না। আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, তাঁর কাছে চায় এমন কাউকে তিনি খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। তিনি আপনার জন্য দরজা খোলা রেখেছেন যাতে করে আপনি রামাদানের সেই বাতগুলোতে আপনার সর্বোচ্চটুকু দিতে পারেন। এমনভাবে ইবাদাত করতে পারেন যাতে আধ্যাত্মিকভাবে আপনি হয়ে উঠেন পরিপূর্ণ এবং কৃতজ্ঞতার অনুভব আপনার হৃদয়কে করে তোলে টইটম্বুর।

২। নির্জনতা

আসন্ন রাতগুলোতে মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। এমন জিনিস যেগুলো আপনার ইবাদাতে মনোযোগ নষ্ট কবে, সেগুলোর থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার ফোনে ইন্টারনেট অফ করে রাখুন। আপনার অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার আপডেট আর নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলা উচিত হবে না। এটা "সোশ্যাল" টাইম না, এটা "আমি এবং আল্লাহ"র টাইম। তাই সেটাই বাখুন, যেটা আপনার দরকারি।

যেমন, আপনার হয়তো পরিবার থেকে জরুরি কল আসতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি ফোন খোলা রাখতে পারেন। যদি এরকম জরুরি কিছু না থাকে, তাহলে ফোন বন্ধ রাখুন। আর সব ক্ষেত্রেই, ইন্টারনেট আর সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন।

আশেপাশের লোকজনের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা কিংবা আলাপচারিতায় মশগুল হবেন না। শুধু প্রয়োজনীয় কথাবার্তাই বলুন, এছাড়া বাকি সব কথাবার্তা বাদ দিয়ে দিন।

এই অভ্যাস আপনাকে সুযোগ করে দেবে ইবাদাতের, দেবে শান্তি, দেবে

১] সূরা ফাতিহা, আয়াত-ক্রম:৫

নিজেকে নির্মল, পরিচ্ছন্ন করার সুযোগ। এগুলো হচ্ছে শান্তির রাত,

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

| "শান্তিময় সে রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।" [১]

সুতরাং আপনার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে নিজের জন্য একটা নির্জন, শান্তির পরিবেশ তৈরি করে নিন। যখন আপনার নিজের জন্য আপনার কাছে বেশি সময় থাকরে তখনই কেবল আপনি সেই সময়টাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে ভরপুর করে তুলতে পারবেন। আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথাটিই আসছে আমাদের নেক্সট পয়েন্টে।

৩। কুরআনের সাথে বন্ধুত্ব

এই সময়টা হচ্ছে কুরআনের সময়। এই মাসটা হচ্ছে কুরআনের মাস। এই রাতগুলো হচ্ছে কুরআনের রাত। এসময় যদি কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে হয়, তো সে জিনিসটা হচ্ছে কুরআন।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

| নিশ্চয়ই আমরা এই কুরআনকে প্রেরণ করেছি লাইলাতুল ক্বদরে।" [২]

কিন্তু এখানে কয়েকটা জিনিস মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। কুরআন আপনাকে সেটাই দেবে যেটা আপনি তার কাছ থেকে নিতে চাইবেন। যদি আপনি হিদায়াতের জন্য এটা পড়তে চান, তবে এখান থেকে আপনি হিদায়াতই পাবেন। যদি আপনি স্বস্তি, সুস্থতা আর আলো পাওয়ার জন্য এই কিতাব তিলাওয়াত করতে চান তবে এখান থেকে আপনি আপনার স্বস্তি, সুস্থতা আর আলো পেয়ে যাবেন। যদি আপনি এটা আল্লাহর ঘনিষ্ঠতা লাভের জন্য পড়ে থাকেন, তবে নিজেকে তাঁর আরো কাছে বলে অনুভব করবেন আপনি। যদি এমনি, উদ্দেশ্যহীনভাবে পড়ে থাকেন তবে সাওয়াব পাবেন (সাওয়াব অর্জনে সমস্যার কিছু নেই)। কিন্তু এভাবে পড়লে কোন অর্থবহ উপলব্ধি কিংবা নিজেকে বদলে দেবার মত

[১] সূরা ক্বাদর, আয়াত-ক্রম: ৫

14) সূরা ক্বাদর, আয়াত- ক্রম: ১

অভিজ্ঞতা অর্জনের বদলে আপনি কেবল সাওয়াবটুকুই পাবেন। এখানে মূল কথা হলো কৃতজ্ঞতার সাথে কুরআনকে বিনম্র হয়ে বহন করা এবং এটা মাথায় বাঘা যে এই কিতাবই হচ্ছে সমস্ত "খায়র" তথা কল্যাণের মূল। আল্লাহ যেন এই কিতাবের মাধ্যমে আপনাকে হিদায়াতের পথে চালিত করেন। তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক, দ্যা বেস্ট টিচার।

. الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ

|- "পরম করুণাময়।। । যিনি শিখিয়েছেন তোমাদেরকে কুরআন।" [১]
ভয় নিয়ে কুরআনের কাছে যাবেন না। আল্লাহ তার নিজের জন্য নাম হিসেবে বেছে নিয়েছেন আর রাহমান এবং আর বাহীম। এই দুটো নাম দিয়েই তিনি কুরআনে আমাদেরকে শিক্ষাদান শুরু করেছেন। যখন কুরআন পড়তে শুরু করবেন তখন মনে রাখবেন যে আপনি আল্লাহর বিশেষ রহমতের নিকটবর্তী হয়েছেন। এই কিতাব হচ্ছে রহমত, হিদায়াত আর সম্মানের এবং এগুলো তাবাই অর্জন করতে পারে যাবা এগুলোকে গ্রহণ করে নেয়।

সাত আসমানের উপর থেকে যে উপহার আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে সেটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখুন। এই উপহার আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন সেই রাত গুলোর মধ্য থেকে একটি রাতে, যে বাতের সাক্ষী হচ্ছি এখন আমরা। যখন আপনি আল্লাহর কিতাব

নিয়ে বসবেন বিনম্রতা আর কৃতজ্ঞতার সাথে, তখন আল্লাহ আপনার জন্য এই কিতাব অনুযাবনের দুয়ার খুলে দেবেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى

(السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

"নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শ্রবণ করে মনোযোগের সাথে।" [২]

কুরআন আপনার জীবনকে পাল্টে দিতে পারে। আপনার জীবনকে বদলে

(১) সূরা রাহমান, আয়াত-ক্রম ২

(২) সূরা ক্বাফ, আয়াত- ক্রম। ৩৭

ফেলার এই প্রক্রিয়া আপনি রামাদান থেকে শুরু করে দিতে পারেন, যা কিনা পুরো বছর জুড়ে আপনার সাথে থাকবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এটাই যে আপনি যখন কুরআন পড়তে শুরু করবেন তখন আপনার থাকতে হার সঠিক মনোভাব আর বিশুদ্ধ ও আন্তরিক একটি অন্তর। আপনি সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআনের আয়াত পড়তে পারেন। আপনি বসে বসে মুসহাফ দেখে দেখেও তিলাওয়াত করতে পারেন। যেভাবেই পড়েন না কেন মুমশাই সেটা হতে হবে মনোযোগের সাথে। যদি আপনি চান সাথে অর্থ শা তাফসীরের কিতাব নিয়েও বসতে পারেন। মনে রাখবেন এখানে সবচেয়ে জরুরী বিষয়টা হচ্ছে নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে প্রচেষ্টা চালানো। যদি আপনি পুরো রাত কষ্ট করে মাত্র এক পারাও পড়েন অথবা তোতলাতে তোতলাতে মাত্র কয়েকটা পৃষ্ঠাও

পড়েন তবুও তা উত্তম। মাতৃভাষা আরবি না হওয়ার কারণে অথবা তিলাওয়াতে অনভ্যস্ততার কারণে শুরুতে আপনার একটু কঠিন লাগতে পারে, তিলাওয়াতের গতি মন্থর হতে পারে। কিন্তু এগুলো কোন ব্যাপার নয়। অন্য কেউ যদি খুব সাবলীলভাবে তিলাওয়াত করে আপনার চেয়ে বেশি পারা পড়েও ফেলে তবুও আপনি, হা আপনিই হবেন এখানে দ্বিগুণ পুরস্কারের অধিকারী। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে পারঙ্গম সে সম্মানিত হবে এবং তার জন্য সাওয়াব লেখা হবে, কিন্তু যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়ে এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করে সবচেয়ে সুন্দরভাবে পড়তে, তবে তার জন্য লেখা হবে দ্বিগুণ সাওয়াব।" কুরআন তিলাওয়াতে কোন লস নেই। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার পাবার মত একটি আমল। প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে এখানে সাওয়াব। সাবলীলভাবে যে পড়বে আর ঠেকে ঠেকে যে পড়বে, দুজনই অগণিত পুরস্কার পাবে। তিলাওয়াতের জন্য বিশেষ পরামর্শ: তিলাওয়াতের সময় যখন আপনি জান্নাতের জামাতে পৌঁছাবেন, তখন থেমে যাবেন। আল্লাহর কাছে জান্নাত চেয়ে দুজ করবেন। আল্লাহর কাছে চাইবেন, যেন তিনি আপনাকে জান্নাত দান করেন যখন জাহান্নামের বা এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনের দুঃখজনক ফলাফল সম্পর্কে আয়াত পড়বেন, তখন থেমে গিয়ে আল্লাহর কাছে এসব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। যখন দেখবেন আল্লাহ মুমিনদের বিশেষ কোন গুণের বা গুণাবলীর প্রশংসা করছেন, তখন তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করবেন সেই গুণগুলো নিজের মধ্যে বিকশিত করার জন্য। যখন আপনি আল্লাহর নাম আর গুণাবলী উচ্চারণ করবেন, তখন সেগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন। একটা নোট তৈরি করে ফেললে খুব ভালো হয়, হয়তো এটা আপনাকে রামাদানের পরেও এই নামগুলোর গভীরতা উন্মোচন করতে মনে করিয়ে দেবে। ৪। একটি সহজ, কিন্তু বরকতময় দুআ আপনি কি আপনার আশেপাশে এমনটা দেখছেন যে লোকেরা দুআর লম্বা লিস্ট বানিয়ে নিচ্ছে আর তাদের দুআর কাছে আপনার দুআগুলোকে মনে হচ্ছে তুচ্ছ? আপনার কাছে কি এমনটা মনে হচ্ছে আরবিতে বানিয়ে দুআ করাটা খুব কঠিন? আপনার তাদের প্রতি কি খুব ঈর্ষা হচ্ছে যারা নিজেরা নিজেরাই দক্ষতার সাথে

আরবিতে লম্বা লম্বা দুআ বানিয়ে নিতে পারে? আপনার কি ভয় হচ্ছে যে হয়তো আপনি আল্লাহর কাছে সব কিছু চাইতে পারছেন না অথবা এমন কোন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুআ করতে ভুলে যাচ্ছেন যেটা আপনার জন্য খুব দরকার? যদি উপরের সমস্যাগুলো আপনার সাথে হয়ে থাকে, তাহলে জেনে রাখুন রাসূলুল্লাহ ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাবান, অত্যন্ত দয়ালু এবং আমাদের অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত। সেই মানুষটি আমাদেরকে ইতিমধ্যেই এমন একটি দুআ, সেরা একটি দুআ শিখিয়ে গেছেন যেটা আমাদের জন্য বয়ে নিয়ে আসবে সর্বোত্তম কল্যাণ- এই জীবনেও, ওই জীবনেও। আর এই সেরা দুআটা খুবই সোজা। আপনি এটা আরামসে আমল করতে পারবেন এবং সেরা পুরস্কারটাও লুফে নিতে পারবেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "আমি আল্লাহর রাসূল-কে জিজ্ঞেস করলাম, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি জানতে পারি কদরের রাত কোনটা, তবে আমি তখন কি পড়বো?” রাসূলুল্লাহ বললেন- "বলো,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন। এই দুআটা পাঠে অনেক অনেক বারাকাহ আছে ☆ প্রথমত, এটা হচ্ছে একটা নিদর্শন যে আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন। কারণ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) | "বলুন, (ও মুহাম্মাদ), যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" রাসূলুল্লাহ-এর অনুসরণ এবং একটি সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আপনি পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন। আপনি দুআ করার সঠিক আদব অনুসরণ করবেন। অনেকেই একেবারে সরাসরি তাদের চাওয়া পাওয়া দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করতে শুরু করে। অথচ দুআ করার সর্বোত্তম উপায় হল আল্লাহর প্রশংসা করা, নবী (সাঃ) -এর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করা'। [৩] এরপর নিজের চাহিদা আল্লাহর কাছে তুলে ধরা। এই দুআ এটাই প্রমাণ করে যে আপনি আল্লাহর রাসূল-কে অনুসরণ করছেন যা কিনা আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায়ের একটা রূপ। একইসাথে এটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহর প্রশংসা আদায় করতে এবং তাঁকে তাঁর

পবিত্র নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে ডাকতে। সুতরাং এটা হচ্ছে ইবাদাতের একটা অসাধারণ ও সুন্দর রূপ যেটা একসাথে অনেকগুলো বারাকাহ এবং পুরস্কারকে একত্রিত করে শুধুমাত্র কিছু সুন্দর শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে। [১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ২৫৩৮৪ [২]

সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম: ৩১ [৩]

আল আযকার, ইমাম নববী: ১৭৬

ক্ষমা করার অসাধারণ একটি তাৎপর্য আছে যেটার ব্যাপারে বেশিরভাগই মানুষই জানে না। যদি আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে আমাদেরকে আর নিজেদের গুনাহর অপরাধবোধে ভুগতে হবে না, আফসোস নিয়ে ঘুরতে হবে না, আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় না হবার দুঃখ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে না। যদি আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেন, তাহলে তিনি আমাদের খারাপ কাজগুলোকে মুছে দেন এবং সেগুলোকে ভালো কাজ দিয়ে পাল্টে দেন। যদি আমাদের রব আমাদেরকে মাফ করে দেন, তাহলে তিনি আমাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে সেরা রাস্তাটা অনুসরণ করাকে সহজ করে দেন এবং আখিরাতে সেরা ফলাফল পাবার কাজটাকেও সহজ করে দেন। যদি আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে আমরা তাদের একজন হয়ে যেতে পারি, যারা আল্লাহর খুব কাছের, খুব প্রিয় কিছু বান্দা। যদি আমাদের মালিক আমাদের অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দেন, তাহলে তিনি আমাদেরকে বারাকাহ দিয়ে ভরিয়ে দেন, সেটা হোক দুনিয়ার জীবনে অথবা আখিরাতের জীবনে। তাই, আপনি যদি জানেন না কী বলতে হবে অথবা কী বলা আপনার উচিত, তবে এই দুআটা করতে থাকুন। এমনকি আপনি যদি পুরো রাতও শুধু এই দুআটা পড়েই কাটিয়ে দেন এটার বিশাল অর্থের কথা মাথায় রেখে, তাহলেও আপনার জন্য আফসোসের কোনই কারণ নেই। আপনি যদি অন্য কোন দুআ করতে চান, তাহলে সেটা তো খুবই চমৎকার ব্যাপার। কিন্তু কখনোই এই দুআটার ক্ষমতাকে কম করে দেখবেন না, বিশেষ করে যখন এটা আমাদেরকে শেখানো হয়েছে আমাদের জন্য কাজকে সহজ করে দিতে এবং এটা থেকে আমাদেরকে সেরা ফলাফলটা

দান করতে। ৫। রাতের সালাত মনে করুন, আপনি ইতিকাফ বা মসজিদে রাতের সালাত আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়লেন। অথচ বাকি সবাইই সেটা করছে এবং আপনারও এরকমটাই করার ইচ্ছা ছিল। তখন কী হবে? কী করবেন আপনি? জবাবটা হল, সেটাই করুন, যেটা আপনার সাধ্যের মধ্যে থেকে কুলায়। নিজের সীমার মধ্যে সর্বোচ্চটুকু করতে সচেষ্ট হোন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি রাতের বেলা সালাতে দশ আয়াত তিলাওয়াত করে, তাকে গাফিলদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হবে না। যদি কেউ রাতের বেলা সালাতে একশো আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে তাকে আল্লাহর অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে, আর যদি কোন ব্যক্তি রাতের সালাতে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে বিশাল পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে।" [১]

রামাদানের আদর্শ রুটিন

রামাদানে আমাদের আগের রুটিন এলোমেলো হয়ে যায়। তাই আগেভাগে রামাদানের পরিবর্তিত শিডিউল অনুযায়ী নতুন রুটিন করে রাখলে রামাদান মাসকে আরো প্রোডাক্টিভভাবে আমল করে কাটানো সম্ভব হবে। আমাদের সবার জীবনযাত্রা ও দায়িত্বগুলো একইরকম নয়। আর তাই, সবাব রুটিন এক হবে না এটাই স্বাভাবিক। তবু এখানে একটি খসড়া রুটিন সাজিয়ে দেয়া হল, যা আপনাকে প্রাথমিক ধারণা দিবে যে কোন কাজগুলোকে আপনার বানানো ব্যক্তিগত রুটিনে প্রাধান্য দেয়া উচিত আর কোন কাজগুলোকে কম গুরুত্ব দেয়া উচিত।

☆ সাহরির জন্য উঠন। যদি এসময় খেতে আপনার ভালো না লাগে, তাও উঠে পড়ুন। অল্প কিছু হলেও খেয়ে নিন বা পান করুন, যাতে প্রতি রাতে সাহরীর সুন্নাহ পালন করার প্রতিদান আপনি পেয়ে যান। কেননা সাহরীর মধ্যে আছে বারাকাহ। [১]

☆ এই সময় চেষ্টা করুন দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করার যাতে রাতের শ্রেষ্ঠ অংশে - তিনভাগের শেষ ভাগে আপনি সালাত আদায়ের আর দুআ করার সাওয়াব অর্জন করতে পারেন। নিজের গুনাহর দিকে লক্ষ্য রেখে এই সময়টাকে ব্যবহার করুন এবং এরপর ইস্তিগফার করতে থাকুন। যারা রাতের এই সময়টায় ইবাদাতে রত থাকে, আল্লাহ স্বয়ং তাদের প্রশংসা করেছেন। ২০

☆ প্রিয় ভাই, নিশ্চিত করে নিন যে কমপক্ষে ফজর আর ইশার সালাত আপনি মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করছেন। বেশিরভাগ মানুষেরই কাজেব সময়ের সাথে এই দুই ওয়াক্তের কোন ঠোকাঠুকি যেহেতু লাগে না, অতএব এই দুই ওয়াক্তে জামাআতে সালাত আদায় করা সহজ। যদি

২] সুবা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম: ১৭

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম ১৯২৩, মুসলিম, হাদিস-ক্রম ১০৯৫ [

এটা আপনি করতে পারেন, তাহলে আপনাকে পুরো রাত সালাতে দাঁড়িয়ে। থাকার সাওয়াব দান করা হবে। ১৯

☆ নিশ্চিত করুন যাতে ফজরের সালাতের পর সকালের যিকর আর আসরের সালাতের পর বিকালের যিকর মিস না যায়।

☆ যেদিন কোন কাজের তাড়া নেই, সেদিন চেষ্টা করুন ফজরের সালাতের পর সূর্য না ওঠা পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকার এবং তিলাওয়াত ও যিকরে মশগুল থাকার। সূর্য ওঠার ১৫ মিনিট বা আরো কিছু পর আদায় করে নিন সালাতুদ দুহা। চাইলে সূর্য মাঝ আকাশে ওঠার ১০ মিনিট আগেও। এই সালাতটা আদায় করে নিতে পারেন। যে ব্যক্তি এই সালাত আদায় করবে তাকে একটি পরিপূর্ণ হজ্জ্ব ও উমরাহর সাওয়াব দেওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ। নি

☆ প্রতিদিন কাজে বেরুবার আগে নিয়ত করুন যে, সময়গুলো আপনি কাজে লাগাবেন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য হালাল সম্পদ উপার্জনে, যাতে করে দিনের প্রত্যেকটি মিনিটের জন্য আল্লাহ আপনাকে সাওয়াব লিখে দেন। ৯টা-৫টার চাকরিতে এই বিষয়টা নিশ্চিত করে নিন যে, এই সময়ের ভিতরে আপনার মুখ আল্লাহর যিকর থেকে সামান্য সময়ের জন্যই বিরতি পাবে। এটাও নিশ্চিত করুন যে সব ধরণের গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাখার মাধ্যমে আপনার সাথে সাথে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোও সিয়াম পালনরত অবস্থায় আছে।

☆ ঘরে ফিরে এসে একটু বিশ্রাম নেবার পর একটা ঘণ্টা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াতে বা এর অর্থ নিয়ে পড়াশোনায় উৎসর্গ করুন।

☆ ইফতারের আগের আধাঘণ্টা কাটান একনিষ্ঠ দুআর মধ্যে। কেননা পুরো বামাদানেই রোজাদারের দুআ কবুল হয়ে থাকে।।০।

☆ মাগরিবের পর খাবারদাবার সেবে ইশার আগ পর্যন্ত সময়টুকু শক্তভাবে

কুরআন তিলাওয়াতে অতিবাহিত করুন।

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম ৬৫৯ [২] তিরমিণি, হাদিস-জম ৫৮৬

[৩] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ৭৪৫০

☆ একদিনও যাতে তারাবিহ সালাত মিস না হয়, সেটা নিশ্চিত করুন। সেই মসজিদটাই বেছে নেন যেখানকার তিলাওয়াত আপনার অন্তরকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে।

☆ প্রতিদিন সাদাকাহ করুন। এজন্য আপনার জন্য সহজ, এমন একটি পরিমাণ ঠিক করে নিন। যদি কয়েকদিন ভুলে যাবার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হন, তাহলে একটা দৈনিক খরচের পরিমাণ ঠিক করে নিন।

☆ প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটা ইলমি হালাক্বায় অংশগ্রহণের টার্গেট নির্ধারণ করে নিন। কেননা এইসব মজলিসে ফেরেশতাগণ আগমন করেন এবং এই মজলিসগুলোকে আল্লাহর রহমত চারপাশ থেকে ঘিরে থাকে।

☆ প্রতিদিন একজন আত্মীয়কে দাওয়াত দেওয়া বা তার বাসায় যাওয়ার টার্গেট সেট করুন। কেননা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা মানুষের হায়াতকে বাড়িয়ে দেয়, সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং জীবনের মন্দ সমাপ্তি থেকে তাকে রক্ষা করে।

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ১২১৩

রামাদানের খাদ্যাভ্যাস

বামাদানে ইবাদাত এবং নিজেকে কীভাবে আত্মিকভাবে আরো পরিশুদ্ধ করা যায়, সেই চিন্তা না করে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ৩০ দিন ইফতার ও সাহরিতে কী রান্না করবেন বা কী খাবার তৈরী করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন। রামাদানের এক বা দুই সপ্তাহ আগ থেকেই কেনাকাটার ধুম পড়ে যায়। কিছু মানুষ তো রামাদানের প্রথম কয়েকদিনে চরম অমিতব্যয়ির মতো খাবার বানান, অথচ চিন্তা করেন না পরবর্তীতে তা তাদের উপর কী প্রভাব ফেলবে; বিশেষত যখন তাদের দীর্ঘ তারাবিহর সালাতের জন্য দাঁড়ানোর প্রয়োজন হবে।

এই প্রবন্ধে রামাদানে একজন প্রোডাক্টিভ মুসলিমের খাদ্যাভ্যাস কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে কিছু দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি একটি বিশেষ ডায়েট প্ল্যান বানানোর রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে যা মেনে চললে সিয়ামরত অবস্থায়ও আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন, আপনার এই রামাদান আরেকটি ভোজন-উৎসব হবে না। বরঞ্চ এই রামাদানে আপনি পরিমিত ও সুষম খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্য এবং ওজনকে সঠিক অবস্থানে আনতে পারবেন, ইন শা আল্লাহ!

মানবাদাহ রোজার প্রভাব

যারা আগে কখনও বোজা রাখেন নি তারা হয়ত ভাববেন এটি খুবই প্রান্তিক ও কষ্টকর কিছু হবে। কিন্তু, রামাদানের প্রথম কয়েকদিন রোজা থাকার পরেই আপনার শরীর নতুন রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং উপকারী বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পাদনে রত হবে।

আসলে আমাদের শরীর রোজা রাখার প্রক্রিয়া শুরু করে শেষ খাবার খাওয়ার অর্থাৎ, সাহরি খাওয়ার ৮-১২ ঘণ্টা পর থেকে, যখন সর্বশেষ ভোজনের সব পুষ্টিরস আমাদের পাকস্থলী শুষে নেয় তখন। শক্তি উৎপন্ন করার জন্য আমাদের দেহ প্রথমে কার্বোহাইড্রেট এবং তারপর জমা থাকা চর্বি ব্যবহার করে। যখন রামাদানের খাদ্যাভ্যাস

আপনি কিছুই না খেয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে দিবেন তখন আপনার দেহ জমে থাকা প্রোটিন ব্যবহার করা শুরু করবে এবং মাংসপেশি বা মাসল ভাঙতে শুরু করবে। তখন আপনি অনাহারের পর্যায়ে পৌঁছে যাবেন যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। অন্যদিকে, রামাদানে রোজা রাখায় শারীরিক ক্ষতির তেমন সম্ভাবনা নেই, কারণ রোজা রাখা শুরু হয় ভোরবেলা থেকে আর রোজা ভাঙ্গা হয়ে যায় সূর্যাস্তের সময়ে। উপরন্তু, রোজা রাখার ফলে মানবদেহে জমে থাকা চর্বি স্তর থেকে শক্তি উৎপন্ন করার উপকারী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন কমায়, কোলেস্টেবল এর মাত্রা কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

দিয়াম হলো প্রাকৃতিক বিষনাশক

রোজা রাখার আরেকটি উপকারিতা হল এটি ডিটক্সিফিকেশন তথা বিষনাশে সাহায্য করে। সহজভাবে বললে, আমাদের দেহে অনেক ক্ষতিকর উপাদান চর্বির সাথে জমে

থাকে। চর্বি থেকে যখন শক্তি উৎপন্ন হয় তখন এসব ক্ষতিকর উপাদানগুলো গলে যায় এবং আমাদের শরীরও দ্রুত আরোগ্য প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়।

রোজা রাখার ফলে মানবদেহে আরেকটি উপকার সাধিত হয়। তা হচ্ছে, এটি অধিক পরিমাণ শক্তিকে হজমক্রিয়ায় ব্যবহার না কবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে ব্যয় করে।

আপনি কি কখনো খেয়াল করেছেন, রামাদানে আমাদের শরীর অনেক বেশি ঝরঝরে লাগে? কারণ, সিয়াম আপনার পরিপাকতন্ত্রকে বিশ্রাম দেয় এবং আপনার বিপাকক্রিয়াকে শক্তি যোগায়। ফলে তা আরো কার্যকরভাবে শর্করা খরচ করতে পারে।

যদি আপনার পরিপাক ক্রিয়া দুর্বল হয়, এটি আপনার খাদ্য বিপাক ক্রিয়ার সামর্থ্যে প্রভাব ফেলে এবং চর্বি খরচ করে। সিয়াম আপনার পরিপাক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্বাস্থ্যকর অস্ত্রক্রিয়ার প্রবর্তন করে। এভাবে আপনার বিপাক ক্রিয়াকে উন্নত করে।

কিছু গবেষকের মতে, 'শুধুমাত্র একদিন কিছু না খেলে, আমাদের শরীর বিষাক্ত পদার্থ পরিষ্কার করে ফেলে। এর ফলে শরীরের লিভার, কিডনিসহ অন্যান্য অঙ্গের কার্যক্ষমতা বাড়ে। যাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, নাথান হেউইট তার একটি প্রবন্ধে অনুরূপ কথাই বলেছেন।

যদিও সিয়ামের অনেক বেশি উপকারিতা রয়েছে, যা বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত, তবু, এটা ওজন কমানোর চূড়ান্ত সমাধান হতে পারে না। কারণ, আমাদের শরীরে ওয়াটার বডি রয়েছে যা কমলে শরীরের ওজন তো আপাত কমে, কিন্তু এটি ওজন কমানোর চূড়ান্ত সমাধান নয়। সিয়াম আপনার ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় একটি দ্রুত, লম্বা পদক্ষেপ, কিন্তু এটিই চূড়ান্ত সমাধান নয়।

সিয়াম যেভাবে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বাড়ায়

রামাদান শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছাকাছি হওয়ার আত্মিক অভিযাত্রার নামই নয়, এটি আপনার শারীরিক সুস্থতার যাত্রা শুরুর মাইলফলকও। সিয়ামের অসংখ্য শারীরিক উপকারিতা আছে, এটি আপনাকে আপনার খাবার- দাবার পুনঃমূল্যায়ন করার ও খাদ্যাভ্যাসকে উন্নত করার একটি সুযোগ প্রদান করার মাধ্যমে আপনার ওজন কমানোতে সাহায্য করে।

খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে রাসূল -এর একটি একটি হাদিস উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। নবীজি ও বলেন, "মানুষ পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন পাত্র ভর্তি করে না। (যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে পাত্র থেকে ততটুকু খাদ্য উঠানো কোন ব্যক্তির জন্য দূষণীয় নয়)। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও যদি কোন ব্যক্তির উপর তার নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয়, তবে সে তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।"

খাবারের ব্যাপারে অংশ ঠিক রাখার এই বিষয়টি আমাদের প্রিয় রাসূল প্রায় ১৪০০ বছরেরও আগে পরামর্শ দিয়ে গেছেন, তখনও ওজন কমানোর এত উন্মাদনা শুরু হয়নি। আমরা যদি সত্যিই আমাদের রাসূল-এর এই সোনালি উপদেশ মেনে চলি, তাহলে আমরা নির্বোধের মতো খাওয়া দাওয়া করবো না এবং আমাদের পেট পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা ভরতে থাকবো না। কারণ, তা অবধারিতভাবেই ওজন বৃদ্ধি, অলসতা এবং ক্লান্তি নিয়ে আসে।

(১) তিরমিতি, হাদিস-ক্রম। ২৩৮০, ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম। ৩৩৪৯

রামাদানের খাদ্যাভ্যাস

যারা সারাক্ষণ পানাহারের উৎসবে মেতে থাকে অথবা তাদের এই অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসের ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, সিয়াম পালন আপনার আত্মনিয়ন্ত্রণ বাড়াতে এবং আপনার খাদ্যাসক্তিকে কমিয়ে আনতে সাহায্য পাবে। কেননা, তা আপনাকে শুধুমাত্র অনুমোদিত সময়ে খেতে বাধ্য করে। সেজন্যা, আপনার শবীর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেই নবপরিবর্তনের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রাকৃতিকভাবে, সিয়াম পালন আপনাকে এমন একটি পদ্ধতি খুঁজে পেতে ও মেনে চলতে সাহায্য করে, যেটা পরবর্তীতে অসুস্থদের জন্য স্বাস্থ্যকর, ইন শা আল্লাহ।

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং' ওজন কমায়

কিছু নির্ধাবিত সময়ে না খেয়ে থাকাকে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বলে। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং শরীরের চর্বিসমৃদ্ধ কোষসমূহকে কার্যকরভাবে নষ্ট করে ফেলে, যা শুধু নিয়মিত নির্ধারিত খাদ্যতালিকা অনুসরণের মাধ্যমে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং, সিয়াম বা না খেয়ে থাকাটা ওজন কমানোর একটা নিরাপদ উপায় হতে পারে।

একদিন সিয়াম পালনের পর আপনার জন্য অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করাটা অধিক কার্যকরী, বিশেষত হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে। আপনি সিয়ামবিহীন দিনের তুলনায় সিয়ামরত দিনে বেশি চর্বিসমৃদ্ধ কোষকে খরচ করছেন, কেননা, 'ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং এ আপনার শরীর শর্করার পরিবর্তে চর্বিকে শক্তির প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। বর্তমানে, এমনকি অনেক ক্রীড়াবিদেরাও না খেয়ে থাকাটাকে প্রতিযোগিতার জন্য শরীরের চর্বি কমানোর উপায় হিসেবে খুঁজে পেয়েছেন।

দিরাম অনাহারে থাকা নয়

কিছু মানুষ এই গভীর অনুভূতি লালন করে যে, সিয়াম শরীরকে ক্ষুধার কষ্ট দেয় এবং আপনি তাই 'ক্ষুধায় কাতর হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার মতো অবস্থায় চলে যান। এটি সত্য নয়। সিয়াম দিনের পর দিন অনাহারে থাকা নয়। এটি সহজভাবে, কিছু সময়ের জন্য পানাহার না করা, অনবরত মৌলিক পুষ্টি ব্যতীত দিনের পর দিন নয়।

প্রোডাক্টিভ রামাদান

মার্টিন বেরখান হলেন একজন পুষ্টিবিদ এবং প্রশিক্ষক। তিনি তার প্রবন্ধে উপবাস নিয়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বলেন, "না খেয়ে থাকা মানে না খেয়ে থাকা। এটা কোন একটা খাবার বাদ দিয়ে যাওয়া অথবা ২৪ ঘন্টার জন্য না খেয়ে থাকাটাকে বুঝায় না। অথবা, ৩ দিনের জন্য না খেয়ে থাকাও নয়। তাই, এই বিশ্বাস করা যে, কোন একবেলার খাবার বাদ দিয়ে দিলে অথবা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য উপবাস করলে তা 'ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার অবস্থায়' নিয়ে যাবে, এটি পুরোপুরি হাস্যকর ও অযৌক্তিক।"

পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাসে থিতু হওয়ার কর্মযজ্ঞ

রামাদানের পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য অনেক মুসলিমই রামাদানের আগের মাস তথা শাবান মাসে বিক্ষিপ্তভাবে নফল রোজা রাখেন। নবীজি ও শাবান মাসে অনেক বেশি রোজা রাখতেন।।১। এটি রামাদানের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে অভ্যস্ত হতে সাহায্য করে।

একইভাবে দিনে-রাতে কিছু নির্দিষ্ট সময় ঘুমানোর অভ্যাস থাকলে, ফজরে ঘুম থেকে উঠার এবং রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর নিয়মিত অভ্যাস থাকলে আপনার জন্য রামাদানের রুটিনে অভ্যস্ত হওয়া অনেক সহজ হবে।

আপনি যদি অনেক বেশি চা-কফি পান করতে পছন্দ করেন তাহলে রামাদানের আগেই ধীরে ধীরে পান করার সংখ্যা কমিয়ে ফেলুন। রামাদানের অন্তত কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে এসবের পরিবর্তে লেমোনেড, হারবাল চা এবং পানি খাওয়ার অভ্যাস বপ্ত করুন।

অসময়ে নাশতা ও ফাস্টফুড খাওয়ার বাজে অভ্যাসও পরিত্যাগ করে ফেলুন। এসব খাবার আসক্তির মত। অভ্যাস আগে থেকে না বদলালে রামাদানে অসময়ে এসব খাদ্য খেতে ইচ্ছা করবে।

ইবাদাতকে অগ্রাধিকার দিন, রান্নাকে নয়

বহু লোক রামাদানকে সর্বোত্তম খাবার তৈরীর মাস হিসেবেই দেখে। তারা ভাবে যেহেতু সারাদিন না খেয়ে থাকা হচ্ছে, তাই সন্ধ্যায় ব্যতিক্রমী কোন খাবার খেয়ে পুরষ্কৃত হওয়া উচিত। অথচ, রামাদান তো একটি বার্ষিক সুযোগ- আমাদের

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম ১৯৬৯, মুসলিম, হাদিস-ক্রম ১১৫৬

রামাদানের খাদ্যাভ্যাস

গুনাহসমূহকে মুছে ফেলার জন্য, আমাদের জীবনধারাকে পরিবর্তন করার জন্য এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আরো কাছে আসার জন্য; যাতে করে রমাদন চলে

যাবার পরেও আমরা সঠিক পথে থাকতে পারি, এবং রামাদারে যেসব ভালো কাজ ও অভ্যাস গড়ে তুলেছিলাম তা চালিয়ে যেতে পারি।

রমাদান বা অন্য যেকোন মাসই হোক না কেন, খাবারের ব্যাপারে আমাদের মনোযোগ অভিন্ন থাকা উচিত। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য সিয়াম পালন করি। তাই অতিরিক্ত সময় রান্নাঘরে ব্যয় করে নিজের নফসকে পুরস্কৃত করার কোন মানে হয় না, যখন আমাদের প্রকৃত পুরস্কার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইতোমধ্যেই লিখে ফেলেছেন।

এজন্য আমাদের প্রাথমিকভাবে আত্মিক পরিশুদ্ধির প্রয়োজন। আমাদের খাবারদাবার বছরের আর সব দিনের মত যেন রামাদানেও একই রকম সাধারণ থাকে।

রামাদানে হাইড্রেটেড খাবার খাওয়ার গুরুত্ব

রমাদানে ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা রোধে এমন খাদ্য খাওয়া উচিত যা পানি ধরে রাখতে পারে। আপনি যদি খুব বেশি পানি পান করতে নিরুৎসাহিত বোধ করেন তবে আপনার জন্য হরেক রকমের মজাদার খাদ্য খেয়ে ডিহাইড্রেশন রোধ করার সুযোগ রয়েছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে দই পছন্দ করি। এটি দীর্ঘ সময় তৃষ্ণা দূরীভূত করে। এক কাপ দইতে শতকরা পঁচাশি ভাগ পানি থাকে। এছাড়া থাকে পাকস্থলীর জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও অনেক ক্যালসিয়াম। এছাড়া ফলের জুস, লেটুস, শসা, টমেটো, নারিকেলের পানি ও তরমুজও খুব ভালো খাবার যা শরীরের পানি ধরে রাখতে সহায়তা করে।

সঠিক খাবার খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা

যদিও আমি ইফতারে খাবার খাওয়া নিয়ে অনেক মনোযোগ দিচ্ছি না, কিন্তু আমি জানি সঠিক খাবার খাওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজ কিংবা স্কুলের জন্য রামাদানে আমাদের বেশিরভাগেরই ভিন্ন ভিন্ন কর্মপরিকল্পনা থাকে। আমাদের মধ্যে যারা সারারাত জাগতে পারেন না, তাদের যথাযথ ঘুমের সাথে যথেষ্ট প্রোডাক্টিভ রামাদান

খাবারও খাওয়া প্রয়োজন, যাতে কবে আমরা সিয়াম পালন করতে পারি এবং পরবর্তী দিনটি টিকে থাকতে পারি।

খাবারের রুটিন এবং অভ্যাসের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা এই ব্যাপারটা ভুলেই যাই যে আমাদের ওজন বাড়তে পারে। আমাদের না আছে পরিশ্রম করার সময় আর না আমরা অর্গানিক খাদ্যের (যথাসম্ভব প্রাকৃতিক খাবার, কোনরকম রাসায়নিক বা অন্যান্য পরিবর্তন যাতে থাকে না) দিকে মনোযোগ দিই। সবচেয়ে বিস্ময়কয় ব্যাপার হচ্ছে, অনেকে ভাবেন যে ইফতার ও সাহবিতে তৈলাক্ত খাবার দিয়ে নিজের চাহিদা মেটাতে পারলেই পুরো দিনের শক্তি পাওয়া যাবে।

'তৈলাক্ত খাবার আমাদের বেশি শক্তি যোগায়'- এই পুরো ধারণাটাই ভ্রান্ত। সত্যি বলতে, এই ভারী তৈলাক্ত খাবার আপনাকে দ্রুত ক্লান্ত করে দেয়, যখন আপনি দীর্ঘ সালাতের জন্য দাঁড়ান। অর্গানিক খাদ্যের তুলনায় তৈলাক্ত, চর্বিজাতীয় খাবারের ভাঙনের হার অনেক বেশি। সুতরাং, সঠিক প্রাকৃতিক খাবার খাওয়ার প্রতি জোর দিন।

সঠিক খাবার কোনগুলো?

রামাদানে পরিমিত ও নিয়মমাফিক খাদ্য গ্রহণের ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা যে রামাদানে অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসের দরুন আমাদের অনেকের স্বাস্থ্যের উল্টো অবনতি ঘটে। প্রতিবছর রামাদান মাসে অতিভোজনের কারণে সৃষ্ট পাকস্থলীর সমস্যাজনিত রোগী ও ডিহাইড্রেশনের ফলে সৃষ্ট কিডনীর সমস্যাজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়।

রামাদানে আপনার খাদ্যতালিকা সরল ও নিয়ন্ত্রিত রাখুন। আঁশযুক্ত খাদ্য, খনিজ খাদ্য, কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাদ্য ও চর্বিহীন প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বেশি বেশি খাওয়ার চেষ্টা করুন। সঠিক খাবারগুলো সবসময়ই মাটি থেকে উৎপন্ন সবুজ খাবার, যা হলো প্রাকৃতিক প্রতিষেধক এবং অধিকাংশ অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা।

রামাদানের সময় চর্বিযুক্ত, ভাজাপোড়া এবং 'জাংক ফুডের' (নিম্ন পুষ্টিমান সংবলিত পূর্বপ্রস্তুতকৃত অথবা প্যাকেটজাত খাবার) পরিবর্তে আপনাদের ফ্রিজ ও ভাঁড়াবঘরগুলো ফল ফলাদি দিয়ে পূর্ণ রাখা উচিত। যেসব খাদ্য অনেক লম্বা সময় ধরে প্রস্তুত বা রান্না করতে হয়, যেসব খাবারে অনেক চর্বি থাকে বা যেসব
রামাদানের খাদ্যাভ্যাস

খাবার অনেক বেশি ভেজে খেতে হয়, সেসব খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল। কারণ এসব খাবারের কারণে বুকজ্বলা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পানিশূন্যতা ও নিদ্রাহীনতার সমস্যা হয়ে থাকে।

সাহরিতে কী খাবেন?

হাদিসে এসেছে, "নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ যারা সাহরির খাবার খায় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।"।।

সাহরির ব্যাপারে মুসলিম সমাজের মধ্যে দুইটি প্রান্তিক অবস্থা বিরাজ করছে। একদল তো মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে ভারী ভারী সব খাদ্য ও অনেক পদের তরকারি সাজাতে শুরু করে এবং সাহরিতে রীতিমত গলা পর্যন্ত খাবার খায়। আরেকদল আছে যারা আলসেমি করে সাহরিতে তেমন কিছুই খায় না। উভয় অবস্থাই প্রান্তিক। কারণ, এ উভয় অভ্যাসের কারণেই শরীরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যারা অতিভোজন করেন তাদের হজমে সমস্যা হয়। আর যারা একেবারেই কিছু খান না তারা দিনভর মাথাব্যথা, বিরক্তিবোধ, দুর্বলতা, অনিদ্রা ও মনোযোগহীনতায় ভুগেন।

আমাদেরকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। রামাদানে সাহরি খাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ইবাদাত। সাহরির খাবার হওয়া উচিত স্বাস্থ্যকর ও মাঝারি পরিমাণের।

সাহরিতে আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া পাকস্থলীর জন্য উপকারী। আঁশজাতীয় খাবার আস্তে ধীরে হজম হয়, যার জন্য কোলেস্টেরল লেভেল এবং রক্তের সুগার লেভেল অনেকাংশে কমে আসে। এতে করে রোজা রেখেও আপনি দিনভর শক্তি পাবেন। আঁশজাতীয় খাবারের মধ্যে আপনি ওটস, শাকসবজি, ফল বা সিরিয়াল খেতে পারেন।

সাহরিতে কিছু প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়াও উপকারী। ডিম, চর্বিহীন মাংস, দই, বাদাম জাতীয় খাদ্য আপনাকে দিনভর শক্তি যোগাবে।

এছাড়াও ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন জাতীয় খাবার যেমন দুধ, দই, মধু ইত্যাদি খাবেন। দই দিয়ে আপনি বিভিন্ন রকম পানীয় যেমন লাচ্ছি বানাতে পারেন

[১] আল জামিউস সাগির, হাদিস-ক্রম ৪৭৮৫

প্রোডাক্টিভ রামাদান

অথবা দুধ-কলা বা স্ট্রবেরি দিয়ে মিল্কশেকও বানাতে পারেন। খেতে যেমন মজাদার হবে, আপনার শরীরও হাইড্রেট থাকবে সারাদিন।

সাহরিতে খেজুর খাওয়া সুন্নত। নবীজি খেজুর ও শসা একসাথে খেতেন। আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "নবীজি ও শসা খেজুরের সাথে একত্রে খেতেন।"। সাহবিতে ময়দাযুক্ত খাবার যেমন কেক, পেস্ট্রি ইত্যাদি খাবার এড়িয়ে চলুন। লবণযুক্ত খাবার যেমন আচার, সল্টেড বাদাম, সয়া সস ইত্যাদিও যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন। খাবারে লবণের পরিমাণ বেশি হলে আপনি দিনভর তৃষ্ণার্ত অনুভব করবেন। সাহরিতে চা, কফি এসব ক্যাফেইনযুক্ত খাবার মোটেই খাবেন না। কারণ, এসব খাবার সাহরিতে খেলে সারাদিন অস্থির লাগে ও পানিশূন্যতার অনুভূতি কাজ করে।

ইফতারে কী খাবেন?

হাদিসে এসেছে, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন রোজা রাখবে সে যেন (ইফতারে) খেজুর দ্বারা রোজা ভাঙ্গে। তা যদি না পায় তাহলে পানি দ্বারা (ইফতার শুরু করবে)। কারণ, পানি বিশুদ্ধতা দানকারী।"।খ

আমাদের প্রিয়নবী-এর সুন্নত ছিল অল্প খাবার দিয়ে ইফতার করা। আজকাল ডাক্তাররাও হালকা খাবারের দ্বারা ইফতার করার পরামর্শ দিন। ইফতার করার পর অন্তত দশ মিনিট বিরতি দিয়ে ভারী খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। দীর্ঘসময় পর একসাথে বেশি খাদ্য গ্রহণ করলে পাকস্থলীর উপর চাপ পড়তে পারে, এসিডিটি বাড়তে পারে, বমি বমি অনুভূত হতে পারে। এভাবে গোগ্রাসে গিলে ইফতারের পর মাগরিবের নামাজ পড়াও কষ্টকর হয়ে যায়। ইফতারে খেজুর, কিছু হালকা নাশতা স্বাস্থ্যকর কোন পানীয়

গ্রহণ করা উত্তম হবে। এগুলো আপনার শরীরে সুগার, খনিজ এবং পানির মাত্রা পুনরুদ্ধার করবে।

হালকা ইফতার সেরে মাগরিবের নামাজ পড়ে নিবেন। ততক্ষণে আপনার শরীর ইফতারের খাবারগুলো হজম করে নিবে। মাগরিবের নামাজের পর আপনি চাইলে ভারী খাবার গ্রহণ করতে পারেন। আমি অবশ্য তারাবিহর পর রাতের খাবার খাওয়া পছন্দ করি। তারাবিহর আগে রাতের খাবার খেলে তারাবিহর

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম ৫৪৪০, মুসলিম, হাদিস-ক্রম ২০৪৩। [২] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম: ২৩৫৫

রামাদানের খাদ্যাভ্যাস

নামাজে আমার ঘুম ঘুম ও অবসন্ন অনুভূত হয়।

রাতের খাবারে কী খাবেন?

রাতের খাবার হওয়া উচিত মাঝারী মানের নিয়ন্ত্রিত খাবার। ভাল হয় যদি এক পদের তরকারি দিয়েই রাতের খাবার সেরে নিন। এটি পাকস্থলীর জন্যেও উপকারী। তাছাড়া রাতের খাবারে অতিমাত্রায় না খাওয়ার কারণে সাহরির সময়ও খাওয়ার জন্য ক্ষুধা থাকবে। কুরআনে বর্ণিত স্বাস্থ্যসম্মত খাবারগুলো এসময় খেতে পারেন। যেমন ডালিম, ডুমুর, শসা, জলপাই, খেজুর, আঙ্গুর, ইত্যাদি। এছাড়া মধু, দুধ, মাংস ইত্যাদিও খেতে পারেন।

রামাদানের খাবারের ব্যাপারে আরো কিছু পরামর্শঃ

- যারা পরোটা খেতে পছন্দ করেন, তারা তেল ছাড়া রুটি খাবেন

- বেশি না ভেজে হালকা ভাজা খাবার খাবেন

-

গ্রীষ্মকালে মাছ-মাংস কমিয়ে খাবেন কারণ এগুলো খেলে ঘন ঘন তৃষ্ণা জাগে

- মিষ্টান্ন হিসেবে দুধ ও দই খাবেন

- তরকারিতে লবণ ও তেলের পরিমাণ কমিয়ে মশলা, আদা, রসুন কিংবা লেবু দিয়ে স্বাদ বৃদ্ধি করবেন

রামাদান মাসে আমলে মনোযোগী হওয়ার উপায়

কয়েক সপ্তাহ আগে এক মঙ্গলবারের কথা। আমি প্রচণ্ড ব্যস্ত। ডকুমেন্ট লিখে কয়েকরতে হবে, প্রিন্ট করতে হবে, তারপর কপি, ফাইলিং - কত কি কাজ। মিনিট আর ঘন্টার সাথে পাল্লা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আমি। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে যতোটা বেশি কাজ করে ফেলা যায় আরকি। সূর্য ডোবার সময় বাড়ির পথ ধরলাম। সূর্য ডুবছে, আকাশ প্রায় কালো হয়ে যাচ্ছে, এমন সময় আমার খুশ হলো যে সারাদিন কিচ্ছু মুখে দেইনি। একেবারে ফজরের পর থেকে কোন কিছুই খাওয়া হয় নি আমার। কিন্তু আমি সাওম পালন করছিলাম না। তবুও ক্ষুধার যন্ত্রণা সারাদিনের মধ্যে একবারও আমাকে ভোগায় নি।

কিন্তু আগের দিন এরকম হয় নি। সেদিন ঠাণ্ডায় কাঁপছিলাম, ছিলাম ক্ষুধার্ত, তন্দ্রাকাতর আর একইসাথে সিয়ামরত। বারবার ঘড়ি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম আর কত মিনিট, কত ঘণ্টা বাকি মাগরিবের আযান আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার।

জিজ্ঞেস করতেই পারেন, এই দুইদিনের মধ্যে তফাতটা ছিল কোথায়?
উত্তরটা হচ্ছে। লক্ষ্যে।

প্রথম দিন আমার একটা ডেডলাইনে পৌঁছুবার দরকার ছিল। হাতের কাজ শেষ করবার তাড়া ছিল আমার। আমার একটা লক্ষ্য ছিল সেদিন। এটা ছিল ডু অর ডাই পরিস্থিতি।

আর যেদিন সিয়ামরত অবস্থায় ছিলাম সেদিন আমার লক্ষ্য ছিল মাত্র একটাই- খাবার। আমার ইচ্ছে ছিল যত জলদি পারা যায় খাবারটা আমার পেটে পড়ুক আর আমাকে উষ্ণতায় ভরিয়ে দিয়ে আবারো সুখী করে তুলুক।

আরো একটা রামাদান আমাদের দোরগোড়ায়। এই সময়ে যে প্রশ্নটা এক নাম্বারে উঠে আসে সেটা হচ্ছে: আমাদের লক্ষ্যটা কী আসলে?

আমরা কি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতি ঘণ্টায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবো? আমরা কি কেবল ক্যালেন্ডাবে আরো একটা দিনের উপর টিক দিতেই সাওম পালন করবো? ৩০ দিন শেষে কুরআন খতম করতে হবে, এরকম কোন বাধ্যবাধকতার অনুভূতি নিয়ে কি আমরা কুরআনের জুযের পর জয় পড়েই যাবো? আমরা কি তারাবিহতে দাঁড়াবো শুধু আমাদের সমাজ কিংবা পরিবারকে খুশি করার জন্য?

এভাবেই একটার পর একটা রামাদান আসে আর যায়, আর আমাদের ঈমানের মানদণ্ড একেক সময়ে একেক স্তরে উঠানামা করতেই থাকে আর করতেই থাকে। সম্ভবত, আমাদের ইবাদাতগুলো এখন স্রেফ কিছু আচার অথবা প্রথায় রূপ নিয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা রামাদানকে চিনে থাকি। এটা একটা বিপজ্জনক আব পিচ্ছিল ঢালের মত। কারণ এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণ হয়ে যায় যে আমাদের কাজের সাথে খুব সামান্যই চিন্তার সংযোগ থাকে, এই সামান্য সন্তাও অনেকের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। সিয়ামরত অবস্থায় অফিসে যাওয়া আমাদের জন্য হয়ে যায় কেবলই খালি পেটে অফিসে যাওয়ার নামান্তর। ক্ষুধার প্রতিটি আঘাতের সময় আমরা ভুলে যাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে। আমরা ভুলে যাই-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

(كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববতীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী। হতে পারো। [১]

আমরা ক্ষুধার আগাতে ভেতরে ভেতরে একেবারে অস্থির হয়ে যাই, কাতরাতে শুরু করি। আর আমাদের খালি পেটকে ইফতারের সময় মজার মজার খাবারে ভরপুর করে তোলার চিন্তায় সান্ত্বনা দেই। ফলাফল দাঁড়ায় এটাই যে, আমাদের সিয়াম অর্থহীন হয়ে যায়।

ইন্টারেস্টিং বিষয়টা হল যে, সিয়াম সম্পর্কিত এই আয়াতে তাকওয়ার অর্থ করা

১/ সূরা বাকারাহ, আয়াত-১৮৩

হয় "আল্লাহ সচেতনতা" হিসেবে। হুমম ইন্টারেস্টিং। অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাওম বাধ্যতামূলক করেছেন যাতে করে আমরা তাঁর ব্যাপারে আরো সচেতন হতে পারি। অথচ কয়েকদিন আগে আমি যা করছিলাম সেটা ছিল ঘড়ির ব্যাপারে সচেতন হওয়া।

আমরা অমনোযোগী হয়ে তারাবিহ আদায় করি আর কিয়ামে দাঁড়িয়ে কুরআনের শব্দগুলো এমনভাবে শুনি যার কোনকিছুই আমাদের মাথার মধ্যে আলোড়ন তুলে না। আমরা কুরআন বুঝি না, আর তাই কুরআনও আমাদের স্পর্শ করে না। আমরা কিয়াম থেকে রুকুতে যাই, রুকু থেকে সিজদাহ, সিজদাহ থেকে জলসা, তারপর আবার সিজদাহ, তারপর কিয়াম এবং তারপর আবার করুকু... এভাবে চলতে থাকে একটা চমৎকার, চাঙ্গা করে দেবার মত রুটিন। রুটিনটা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা আমাদের মূল পেশীগুলোকে শক্তিশালী করে তুলতে চাই। কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে আমরা কী অর্জন করেছি? এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও যদি আমরা একই কাজ করি তাহলে মুসহাফে লেখা শব্দগুলো যে আমাদের অপেক্ষায় আছে বছর বছর, সেগুলোর কী হবে?

এই রামাদানে তাই আসুন, আমরা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। আসুন, আমরা ডুবে যাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করাতে, যাতে করে বারবার ঘড়ির দিকে না চাওয়া লাগে। আর কখন সমুচা আমাদের ঠোঁট স্পর্শ করবে, এটা নিয়েও ভাবা না লাগে। বরং এখন থেকে আমরা আমাদের ক্ষুধা অনুভব করবো সচেতনভাবে। সতর্ক থাকবো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ব্যাপারে, সতর্ক থাকবো আমার মুখে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের ব্যাপারে, সতর্ক থাকবে। মনের মধ্যে খেলে বেড়ানো অথবা অন্তরে প্রবেশ করা যেকোন চিন্তা চেতনার ব্যাপারে। আসুন, এই মাসের প্রতিটি দিনে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই ছোট্ট সময়ের ভিতরেই আখিরাতের অনেকগুলো ডেডলাইনে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকি।

ইনশাআল্লাহ, একটি সচেতন রামাদানের জন্য আমাদেরকে সহায়তা করতে কিছু পরামর্শ আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি। আশা করি, নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো অনুসরণ করতে পারলে আমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারব এবং আমলে আরো বেশি মনোযোগী হতে পারব।

১। মনাক লাক্ষার প্রতি নিবদ্ধ করা

জাস্ট ফোকাস করুন। নিজেকে বর্তমানে নিয়ে আসুন এবং সত্যিকার অর্থে এটার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন। যখন সাহরীর জন্য ঘুম থেকে উঠবেন, তখন ভারী খাবারদাবার দিয়ে সাহরী করবেন না। বরং সাহরি করুন একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। ঘুম থেকে ওঠার প্ল্যান করুন। কারণ এটা আমার রাসূল ৬-এর একটা সুন্নাহ আর এটার মধ্যে বারাকাহ আছে, কেননা রাসূলুল্লাহ • এমনটাই উল্লেখ করেছেন-

"তোমরা সাহরী গ্রহণ করো, কারণ এতে বারাকাহ রয়েছে।" ।১।

রাতের বেলা ঘুমানোর ব্যাপারে কঠোর হন। ঘুমানোর সময়ে একটা এলার্ম সেট করে নিন যাতে সেটা আপনাকে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে করে আপনি বিশ্রাম পাবেন এবং সতেজ হয়ে ঘুম থেকে উঠবেন। একইসাথে আগামী দিনের সমস্ত পুরস্কার লুফে নেবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। এই সবকিছুই হবে সাহরী দিয়ে সিয়াম শুরু করার মাধ্যমে। আর মনে রাখবেন, আপনার ঘুমটাও কিন্তু 'ইবাদাত।

এছাড়াও পুরো দিন জুড়ে নিজের কাজ এবং কথার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দেবেন যে, আপনি এখন সিয়ামরত অবস্থায় আছেন। এটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার মত বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মত কিছুতে পরিণত করবেন না। মনে রাখবেন, শুধু খাবার আর পানি থেকে বিরত থাকার চেয়েও বেশি কিছু হচ্ছে আমাদের সাওম। এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "যারা মিথ্যা কথা এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করবে না, তাদের খাবার-পানি থেকে বিরত থাকার কোন জরুরত আল্লাহর নেই।"।

যখনই নিজের কামনা বাসনার প্রতি তাড়না অনুভব করবেন এবং সাওমের উদ্দেশ্যের উপর আপনার মনোযোগ হারিয়ে যেতে থাকবে, তখন নিজের সঁধিক শক্তিবৃদ্ধিকে ব্যবহার করুন। যাতে করে নিজেকে এবং অন্যদেরকে মনে করিয়ে দিতে পারেন যে, আপনি সিয়াম রাখছেন মন্দ কথা ও কাজ থেকে। রাসূলে কারীম ও বলেছেন:

১) বুখারী, হাদিস-ক্রম। ১৯২৩: মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ১০৯৫ ১) বুখারী, হাদিস-ক্রম। ১৯০৩

যদি সিয়াম পালনরত অবস্থায় কোন মূর্খ ব্যক্তি এসে তোমার সাথে ঝগড়া বাঁধায়, তবে তাকে বলে দাওঃ আমি সায়েম (সিয়াম পালনকারী)।" ।৯

উপদেশ হিসেবে এটাই আপনার জন্য এবং বাকি সবার জন্যও যথেষ্ট। প্রায়ই আমাদের মৌখিকভাবে, কখনো বা উচ্চস্বরে নিজেদেরকে নিজেদের লক্ষ্যগুলো। জানি করিয়ে দেওয়া লাগে। নিজেকে ইতিবাচক কথা শুনিয়ে সঠিক পথে ফিরে আসতে চাপ প্রয়োগ করার ধারণাটা কারো কারো কাছে পাগলামি লাগতে পারে। কিন্তু এটা আমার প্রতিদিনের এমন একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এটা না করলে আমার একা একা লাগতে শুরু করে।

আরো মনে রাখবেন রাসূলুল্লাহ-এর অমূল্য উপদেশ। তাঁর এই উপদেশ সেই সময়ের জন্য যখন আমরা হতাশ হয়ে যাই। তিনি বলেন, "যদি কেউ রাগত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সে যেন বসে যায় যাতে তার রাগ চলে যায়। এতেও যদি বাগ না যায়, তবে সে যেন শুয়ে পড়ে।" এয়

আমরা এই একই নিয়ম অনুসরণ করতে পারি যখন আমরা এমন কোন কিছু করার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি যা সিয়ামরত অবস্থায় করা উচিত নয়। আবার কখনো কখনো সময় অপচয়কারী কাজকারবার (টিভি, সোশ্যাল মিডিয়া, গ্যাজেটস, গেম খেলা ইত্যাদি) আর খারাপ অভ্যাস থেকে যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই তবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। একটা খারাপ অভ্যাস বা খারাপ মেজাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা, অবস্থান বদল করা, অথবা এই পরিবেশ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোন রুমে চলে যাওয়া হচ্ছে এমন কিছু কার্যকরী পরামর্শ যেগুলো আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে সাহায্য করবে পুরো মাস জুড়ে এবং ধরে রাখবে আমাদের মনোযোগ জরুরি বিষয়ের উপরে।

২। আয়াত মুখস্ত করা

যখন আপনি ফরজ সালাতের জন্য দাঁড়াবেন, তখন যদি আপনি না জানেন যে আপনি সালাতে কি পড়ছেন, তাহলে সেটা আপনার উপর খুব কমই প্রভাব ফেলবে। ধরুন, আপনি রাশিয়ান ভাষায় কারো সাথে ভালো আলাপ আলোচনায়

[১] বুখারি, হাদিস। ১৮৯৪, মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ১১৫১, আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম: ২৩৬৩ নাসাঈ, হাদিস-ক্রম ২২১৬, ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম। ১৬৯১) মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম ৭৪৮৪ [২] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম। ৪৭৮২, মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম ২১৩৮৯

মন্ড হয়ে আছেন। ধবে নিন রাশিয়ান আপনার ভাষা না। আপনি এই আলাপ আলোচনা চালাতে পারছেন কারণ আপনি আগেই মুখস্ত করে নিয়েছেন কী বলতে হবে। মুখস্ত করে কথা বলছেন বলে নিজে কী বলছেন সেটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না। এই কথোপকথন অনর্থক। যদি আমরা সালাতে তিলাওয়াত কবা আয়াতের অর্থ বুঝতে না পারি, তবে আমাদের সালাতের দশাও ঠিক এমনই।

অল্প দিয়ে শুরু করুন। সালাতের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যেতে যতগুলো বাক্যাংশ আমরা পড়ি, সেগুলোর অর্থ দিয়ে শুরু করা যাক। সূরা আল ফাতিহার অর্থ দিয়ে শুরু করতে পারেন, যদি ইতিমধ্যে এটা আপনার অজানা থেকে থাকে।

আর যদি আপনি অর্থ জানেন, তাহলে প্রত্যেকটি আয়াতকে অনুভব করুন। আমরা সেই মুহূর্তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে কথাবার্তা বলছি আর আল্লাহ আমার

কথার জবাব দিচ্ছেন। চিন্তা করুন তো! মাত্র একবার চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ আপনার কথার জবাব দিচ্ছেন?!

তারাবিহব ক্ষেত্রে সালাতে তিলাওয়াত করা হবে এমন প্রতিটি সূরার শব্দের অর্থ রামাদান আসার আগেই শেখা হয়ত সম্ভব হবে না। এর পরিবর্তে, আপনার মসজিদ থেকে জেনে নিন প্রতি বাত কুরআনের কতটুকু তিলাওয়াত করা হবে, তারপর সময়ের আগেই প্রস্তুত হয়ে নিন। রাতে যতটুকু তিলাওয়াত করা হবে, ততটুকুর অর্থসহ পড়ে ফেলুন আগেই আব পারলে প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটও পড়ে নিতে পারেন।

এভাবে যখন আপনি সালাতে দাঁড়াচ্ছেন এবং আপনার নিয়ত থাকছে যে আপনি সালাতে পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকবেন, তখন আপনার মাথায় এটা ঘুরবে না যে- এইমাত্র রাতের খাবারে আপনি কি খেলেন অথবা 'ইশার সালাতের আগে কোন বিষয়টা নিয়ে মজা করতে পারেন নি এবং ঘরে গিয়ে সেটা শেষ করে আসার জন্য অপেক্ষা করতে পারছেন না।

আপনাকে সালাতে দাঁড়িয়ে কান খুলে মনোযোগের সাথে ইমামের তিলাওয়াত শুনতে হবে, আয়াতের অর্থ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে, ভাবতে হবে যে প্রেক্ষাপটে আয়াতটা নাযিল হয়েছিল, কল্পনা করতে হবে আয়াতটা এখন নাযিল হচ্ছে রাসুলুল্লাহ ﷺ - এর উপর।

৩। আল্লাহর সাথে কথা বলুন

যেকোন কিছুর চেয়ে রামাদান আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাস হয়ে উঠাটা বেশি জরুরি। আল্লাহর সাথে এই সম্পর্ক না

থাকার কারণেই আমরা ইবাদাতে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারি না। উদাসীনতার সাথে কোনমতে কাজ সেরে নেই। এটার কারণ হল, আমরা আসলে জানিই না আমরা কার ইবাদাত করছি, কার সাথে কথা বলছি। তো এই মাসে এই সমস্যাটা দূর করে ফেলুন। বসুন, শুধু আপনি আর আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা, আর কেউ নয়। আল্লাহর সাথে শুরু করুন গভীর, সত্যিকারের এক কথোপকথন। গভীরতা আনুন আপনার ভাষায়, আপনার শব্দে। মন খুলে কথা বলুন, নিজের সমস্ত লুকোনো কথা, লুকোনো অনুভূতি খুলে বলুন আল্লাহকে। কিংবা সারাদিন ধরে তাঁর সাথে কথা বলতেই থাকুন, বলতেই থাকুন। আপনি ড্রাইভিং করছেন, হুইল ঘোরাতে ঘোরাতেই আল্লাহর সাথে কথা বলুন। কাজে ব্যস্ত আছেন, এই অবস্থাতেই আল্লাহর সাথে কথা বলুন। কাপড় পরছেন, নিজেকে আয়নায় দেখে নিচ্ছেন, তখনও আল্লাহর সাথে কথা চালিয়ে যান।

আর মনে রাখুন যে আল্লাহ ববুল ইযযাহ বলেছেন, তিনি আমাদের সাথে তেমনই যেমনটা আমরা তাঁকে নিয়ে চিন্তা কবি। ১৯

আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লাকে বানিয়ে নিন আপনার বন্ধু, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। দেখবেন, সালাত আপনার কাছে তখন খুব একান্ত কিছু একটা হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে আপনার জন্য সবচেয়ে স্বস্তির জায়গায় প্রত্যাবর্তন যখনই আপনি আপনার হাত দুটো তুলে উচ্চারণ করবেন, "আল্লাহু আকবার।"

আল্লাহর কিন্তু ৯৯টা নামও আছে। যদিও বেশিরভাগ সময়েই, তাঁকে আমবা ডাকি শুধু এক নামে। আর অন্য কোন নাম জেনে থাকলেও সম্ভবত সেগুলোর অর্থ না জানা থাকায় আমরা বুঝতে পারি না কখন, কোন নামে তাঁকে ডাকা উচিত। যদি আমরা আল্লাহর নামই না জানতে পারলাম, তাঁর গুণাবলী নাইই শিখতে পারলাম, তাহলে বুকে হাত দিয়ে কি এটা বলা যাবে যে সত্যি সত্যিই আমরা আল্লাহকে চিনতে পারলাম?

যদি আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমত চাই, তবে আমাদের উচিত তাঁর নাম, আর রাহমান (পরম করুণাময়) ধরে ডাকা। যদি আমরা চাই আল্লাহ আমাদের আগের সব গুনাহ মাফ করে দিন, তবে আমরা ব্যবহার করবো তাঁর নাম আল 'আফুউ', অর্থাৎ যিনি ক্ষমা করেন। এভাবে আল্লাহকে ডাকার মাধ্যমে আমরা নিজেদের বারবার মনে করিয়ে দিতে পারবো যে আল্লাহ কে, কী তাঁর পরিচয়। তাঁর সাথে আমাদের এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করবে, যে সম্পর্ক আমাদেরকে নিয়ে যাবে আল্লাহর সাথে শুধু সৃষ্টিকর্তা আর সৃষ্টির সম্পর্কেরও অনেক অনেক বাইরে। আমাদের রব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য শুধু সৃষ্টিকর্তার চেয়েও আরো অনেক, অনেক বেশি কিছু।

(১) বুখারি, হাদিস ক্রম ৭৫০৫,৭৫০৭, মুসলিম, হাদিস ক্রম ২৬৭৫

৪। হোঁচট খাবেন আপনি

আপনি পড়ে যেতে পারেন। হোঁচট খেতে পারেন। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে চেষ্টা কখনো বন্ধ করা যাবে না। যদি কোন একদিন আপনার পা পিছলে যায়, গুনাহ করে ফেলেন আর ভাবেন আপনার সিয়াম তো ব্যর্থ হয়ে গেল; যদি মনে হয় আপনি কী করছেন এবং কেন করছেন সেটা নিয়ে আপনার সমস্ত সচেতনতা অকার্যকর হয়ে গেল; তবুও কখনো বাকি মাসটুকু "এই ভাবেই কাটিয়ে দেব", এই ধোঁকায় পড়ে যাবেন না। ভুলকে টার্নিং পয়েন্ট

হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে নিজেকে রিমাইন্ডার দিয়ে রাখুন কিসের জন্য আপনি

কাজ করে যাচ্ছেন।

রামাদান নিয়ে লেখা আর্টিকেল পড়ে অথবা কিভাবে কী করা উচিত বা উচিত নয়, এই সংক্রান্ত ভিডিও দেখে নিজেকে অনুপ্রেরণায় ভরিয়ে রাখুন, উদ্বুদ্ধ করুন। আলহামদুলিল্লাহ, অনলাইনে এইরকম আর্টিকেল, ভিডিও আছে প্রচুর। আর দেখেন না, আপনি তো একেবারে রাইট ট্র্যাকেই আছেন এখন। আপনি এই আর্টিকেলটা পড়ছেন। গুড, গুড, চালিয়ে যান মাশাআল্লাহ!

আরো একবার বলি, নিজের সাথে কথা বলুন। নিজেকে বলুন, হাল ছেড়ে দেওয়া চলবে না। নিজেকে বলে দিন, এই বছর, এই রামাদানটা আপনার জন্য অর্থবহ হতে যাচ্ছে। এই বছরটাতেই আল ওয়ালি'র (আল্লাহর গুণবাচক নাম যার অর্থ বন্ধু, সাহায্যকারী) সাহায্যে আপনি ঠিকঠাক সবকিছু করতে যাচ্ছেন। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখাটা যেকোন কিছুতেই সাফল্য পাবার জন্য খুব জরুরি। রামাদানের ক্ষেত্রেও এটার ব্যতিক্রম হবে না। এমনকি রামাদানে কোন একটা দিন যদি আপনার খুব খারাপও কাটে, যদি এমন মনে হয় যে আপনি একেবারে শূন্য অবস্থায় পড়ে আছেন অথবা কারো সম্পর্কে বাজে কোন কথা বলেছেন যদিও আপনি জানেন যে সেটা উচিত হয়নি, তবুও শয়তানকে সুযোগ দেবেন না, তার দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচকতা যেন আপনাকে এটা বলতে না পারে যে তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, তুমি উপযুক্ত না, তুমি যথেষ্ট ভালো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে একেবারে পারফেক্ট হিসেবে পাওয়ার প্রত্যাশা করেন না। তিনি তো কেবল এই প্রত্যাশাই করেন যে আপনি যতবারই পড়ে যান না কেন, আবার এবং বারবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন আপনি। আল্লাহ তো কেবল এটাই দেখতে চান, ভালোবাসেন। আল্লাহ পছন্দ করেন তাওবাকারিদের।

৫। যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করুন

মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে একসাথে সব করতে নেমে যাবেন না। লম্বা সময়ের জন্য কুরআন তিলাওয়াত অনেকসময় তার অর্থবহতা হারিয়ে ফেলতে পারে, হয়ত

আপনি মুখের দ্বারা তিলাওয়াত চালিয়ে যাবেন, কিন্তু অন্তর তিলাওয়াতের সাথে যুক্ত থাকবে না। এমন অবস্থা হয়ে গেলে একটা বিরতি নিন। এমন কিছু করুন যার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিতে পারেন। এমন কোন আমল করুন, যেটা করলে আমলে আল্লাহর সাথে জুড়ে যাবার অনুভূতি হয়।

নিজেকে চিনুন। আরেকবার পর্যালোচনা করে নিন আপনার দৈনিক রুটিন। যেমন কাজের রুটিন, পরিবার আর অন্যদের সাথে আগে থেকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও অন্যান্য দায়িত্বের ব্যাপারগুলো। তারপর আপনার দৈনিক রুটিন থেকে যেসব জিনিস বাদ দেওয়া সম্ভব সেগুলোকে আলাদা করুন এবং সেই কাজগুলো বাদ দিয়ে আপনার সময়কে 'ফ্রি' করুন; যাতে আল্লাহর সাথে নিজেকে জুড়ে দেওয়ার মত আমল করার জন্য আপনি আরো বেশি সময় বের করে নিতে পারেন। বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। পরিস্থিতি আর আপনার সক্ষমতার সাপেক্ষে বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ আপনাকে নিজের কাজের ব্যাপাবে মনোযোগী হতে আর সচেতন থাকতে সাহায্য করবে।

প্রতিদিন আর পুরো মাসের জন্য বাস্তবধর্মী লক্ষ্যের একটা চেকলিস্ট বানিয়ে ফেলুন। আর সাথে হিসেবে রাখুন প্রতিদিন কেমন উন্নতি হচ্ছে আপনার। কিন্তু সাবধান, বন্ধুদের সাথে সেটাকে তুলনা করতে যাবেন না আবার! আপনারা একই অবস্থানে, একই পরিস্থিতিতে নন।

৬। পুরস্কারটা মান রাখুন

যখন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ব্যাপারে অসচেতন এবং অমনোযোগী হয়ে উঠি, তখন আমাদের ক্ষুধার কোন অর্থ থাকে না। যখন মনে হবে আমি আর পারবো না, আর এক মিনিটের জন্যও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না, তখন নিজেদের ফোকাস

ধরে রাখতে আর আরো বেশি কিছু করার জন্য নিজেকে চাপ দিতে আমাদের উচিত নিজেদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এটা ছাড়া সবকিছুই উদ্দেশ্যহীন আর শূন্য।

জান্নাতের ব্যাপারে ভাবতে থাকুন। জান্নাত দেখতে কেমন হবে? কাকে আপনি জান্নাতে আপনার পড়শি হিসেবে চান? কোন ধরণের ফল আপনার গাছে ঝুলে থাকতে দেখতে চান আপনি? আপনার জন্য কি সেখানে চকলেটের কোন নদী থাকবে নাকি জেলির ঘর? আপনি যেমন চাইবেন আপনার জান্নাত সেরকমই হতে পারে। যদি আমরা মনে মনে আমাদের জান্নাতকে সাজাই, একে করি তুলি বাস্তব, আমাদের জন্য তখন তার জন্য কাজ করা অনেক, অনেক সোজা হয়ে যাবে।

জান্নাতকে নিয়ে পড়ুন, জানুন কত ধরণের পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের রব আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন, মনের মধ্যে এর ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করুন। আপনার লক্ষ্যকে বানিয়ে নিন বাস্তব।

এছাড়াও পুরো বছর জুড়ে কতশত রহমত যে আপনি না চাইতেই পেয়ে যাচ্ছেন সেগুলোকে নিয়ে ভাবার জন্য দিনের কিছুটা সময় বের করে নিন। এসব রহমত আমরা না চাইতে পেয়ে গেছি বলে এগুলোকে আমরা আমাদের অধিকার বলে মনে করি। আল্লাহ এখানেও আমাদের রহম করেছেন। আর এই নীরব ধ্যানের সময় যখন হঠাৎ আপনার পেট থেকে অদ্ভুত সব আওয়াজ গুড়গুড়িয়ে আসতে থাকে, তখন স্মরণ করুন তাদের কথা- রাতের বেলা খাবার মত যাদের কাছে কিছুই নেই অথবা সাহরিতে উঠে সামান্য কিছু মুখে দেবার মত কোন খাবার যাদের কাছে নেই।

যখন দেখবেন ক্লান্তি আর ক্ষুধা আপনার ইবাদাতের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, তখন মনে রাখবেন সাওমের অতুলনীয় পুরস্কারের ব্যাপারে বলা অদ্ভুত আনন্দে ভরা হাদিসঃ

রাসূলুল্লাহ ৬ বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই তোমাদের রব বলেছেন: প্রতিটি নেক আমল দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর পুরস্কার দেব।" [১]

"যে কেউ ঈমান নিয়ে এবং পুরস্কারের আশায় রামাদানের সাওম রাখবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"।

কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়াটা স্বাভাবিক। যদি কোন অসাধারণ বিষয়ে আপনার লম্বা সময় ধরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়ে যায়, তাহলে সেটা আর অসাধারণ থাকে না। এটা তখন সাধারণ হয়ে যায়। রামাদান অসাধারণ। কেন? কারণ এই মাসে আমাদের জন্য জমিয়ে রাখা অসাধারণ সব সুযোগ সুবিধা, সারা বছর যত নেক আমল করি সেগুলোর জন্য এই মাসে এক্সট্রা পয়েন্ট, এক্সট্রা সাওয়াব, আর আল্লাহর সাথে একটু বেশিই ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ এবং আমাদের জন্য সবচেয়ে সেরা, অনন্যসাধারণ একটা গিফট কুরআন। কিন্তু এরকম ডজনখানেক রামাদানের পর আমাদের কাছে এটা সাধারণ হয়ে গিয়েছে, আমরা এটার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, কুরআন নাযিল হয়েছে - সেই রকম একটা ব্যাপার। শয়তানকে শেকল পরানো হয়েছে – হুম, বেশ তো! জান্নাতকে রাখা হয়েছে উন্মুক্ত ওহ, তাই নাকি? অসাধারণ! এভাবেই আস্তে আস্তে সবকিছু নরমাল হয়ে গেছে, আমাদের কাছে রামাদানের যেন আর কোন বিশেষত্বই থাকে নি।

কিন্তু এইসব বিষয়ের ইঙ্গিত থাকা স্বত্ত্বেও, আমরা যদি ভালোমতো মনোযোগ দেই আর সচেতন হয়ে উঠি, তাহলে আমরা আরো একবার অনুভব করতে পারবো এই মাসের প্রত্যেকটা দিনের বিশালতা। এই বিশালতার অনুভব আমাদের হতে থাকবে প্রতিদিন, ইনশাআল্লাহ।

আমরা বুঝতে পারবো যে-

☆ আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণ বলে কিছু নেই।

☆ সবচেয়ে বিশাল ব্যাপার হল, আল্লাহ আমাদের সবাইকে বেছে নিয়েছেন। হ্যাঁ, আপনি আপনাকে বেছে নেওয়া হয়েছে আরো একটা রামাদানের সাক্ষী হবার জন্য।

☆ আমরা আমাদের নিজেদের কাছে বাধ্য, এই পবিত্র মাসটিকে সচেতনভাবে, উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে। কারণ আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে ভালোবাসা রয়েছে, সেটা স্রেফ "অসাধারণ!"

(১) মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ৭৪৯৪, বুখারি, হাদিস-ক্রম ১৯০৪, মুসলিম, হাদিস। ১১৫১. তিরমিযি, হাদিস ক্রম। ৭৬৪ [২] বুখারি, হাদিস-ক্রম। ৩৮, মুসলিম, হাদিস-ক্রম ৭৬০

রামাদানের হারিয়ে যাওয়া সুন্নত আমল

আমরা অনেকেই রামাদানে বেশি বেশি ইবাদাত করবার জন্যে সারাদিনের ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যে একটু সময় করে নিতে হিমশিম খাই। কাজ আর পরিবার নিয়ে ব্যস্ততার কারণে নিজের আধ্যাত্মিকতার উন্নতির জন্য সময় বের করা অনেকের জন্যই কঠিন হয়ে যায়। এই সময়ের অভাব অনেককেই হতাশ করে জেনে আমাদের কাছে মনে হতে পারে স্রেফ অতিরিক্ত কাজের চাপে এই পবিত্র মাসের ফায়দাগুলো আমরা নিতে পারছি না।

এক্ষেত্রে বেশ কিছু সহজ আমল আমাদের জন্য রয়েছে, যেগুলো আমরা পুরো দিনব্যাপীই করে যেতে পারি। এমনকি কাজে থাকলেও সেই আমলগুলো করতে কোন সমস্যা হবার কথা নয়। এই আমলগুলোর মাধ্যমে আমরা অর্জন করে নিতে পারি বিশাল বিশাল পুরস্কার, তা সে যত ব্যস্তই আমরা থাকি না কেন। সময়ের অভাব নিয়ে তাই আফসোস না করে রাসূলুল্লাহ-এর মূল্যবান সুন্নাহগুলোর অনুসরণ করলে তা আপনাকে এনে দেবে বারাকাহ, সুযোগ করে দেবে রামাদানের পবিত্র এই সময়ে সুবিশাল সব অর্জনের, একইসাথে আপনার রুহানিয়াত আর সামগ্রিক পারফরম্যান্স, দুটোকেই বাড়িয়ে তুলবে অনন্য উপায়ে।

দেখে নিন ১২টা সুপার সুন্নাহ যেগুলো আপনি ব্যস্ততার মধ্যেও আমল করতে পারবেন।

১। প্রতিদিন নিয়তাক নবায়ন করে নেওয়া

এখানে প্রথমেই দুটো বড় হাদিস আমাদের মনে রাখা উচিত। প্রথমটা হল, আমাদের প্রিয় নবী বলেছেন,

"(আল্লাহ বলেছেন), 'বনী আদমের সব ভালো কাজই তার নিজের জন্য একমাত্র সাওম ছাড়া; সাওম আমার এবং আমিই এর পুরষ্কার দেব।'' নিশ্চয়ই, সায়েমের (রোযাদারের) মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকে আম্বরের চেয়েও উত্তম।

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ৫৯২৭; মুসলিম, হাদিস-ক্রম। ১১৫১

রাসূলুল্লাহ আরো বলেছেন-

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রামাদানের সাওম বাখবে, আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।"।

প্রথম হাদিসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, এই যে লম্বা সময় ধরে আমরা সিয়ামরত অবস্থায় আছি, এই ইবাদাতটা আমরা করছি শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য। তাই, কৃতজ্ঞ হোন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে এই মাসের সাক্ষী বানিয়েছেন এবং তাঁর জন্য এই বিশাল ইবাদাত পালনের সুযোগ করে দিচ্ছেন। রামাদানের এই লম্বা সময়গুলো হচ্ছে আত্মত্যাগের সময়, কৃতজ্ঞতার সময় আর আধ্যাত্মিকতার সময়। এই সময়গুলোতে যদি আপনি কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে সেটা আসলে আপনাকে এনে দিচ্ছে আরো বড় পুরস্কার, যদি আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার খাতিরে দৃঢ়চিত্ত আর অবিচল থাকেন।

তাই, প্রতিদিন নিজের নিয়ত নবায়ন করুন। মনে রাখুন যে সিয়াম এমন একটি কাজ যেটার ফলে আপনার অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। গুনাহ মাফের সাথে সাথে এটা আপনার জন্য নিয়ে আসবে বিশাল আকারের বিশেষ পুরস্কার। আপনার সিয়ামকে কবুল হিসেবে ধরে নেবেন না আবার।

এছাড়াও, আমলের পেছনে নিয়তের ব্যাপারে মনোযোগের অবস্থা হচ্ছে তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ, যে তাকওয়ার উন্নয়নই রামাদানে আমাদের মূল লক্ষ্য। তাকওয়া হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর একটা, যেটার ব্যাপারে আল্লাহ চান যে আমরা তাকওয়াবান হই। আপনি যদি এই মাসে তাক্বওয়া বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেন, তাহলে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠার পথে সেটা হয়ে উঠবে আপনার জন্য অসাধারণ একটা পদক্ষেপ।

সুতরাং, এই রামাদানে আপনার সচেতনতা নিশ্চিত করুন এবং বারবার নবায়ন করে নিন আপনার নিয়ত। নিয়তেই মেলে পুরস্কার, যেমনটা নিয়ত করবেন পুরস্কারটাও সেই অনুপাতেই পাবেন আর তাই আপনার নিয়তটা হতে হবে খাঁটি। রামাদানের জন্য তাই করে ফেলুন বিশুদ্ধ, সুন্দর একটা নিয়ত। যেমনটা

বলেছিলেন আমাদের রাসূল- "প্রতিটি আমলই নিয়তের উপর নির্ভরশীল আর মানুষ তার নিয়ত অনুসারেই প্রতিদান পাবে।"

২। অন্যদের জন্য দুআ করা রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

"যখন কোন মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দুআ করে তখন ফেরেশতারা বলেনঃ আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ।" ।

খুব ব্যস্ত শিডিউলের কারণে আপনি হয়তো বন্ধুবান্ধব আর প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটানোর ফুরসত করে নিতে পারেন না। কাজের ব্যস্ততায় সে সুযোগ আপনার হয়ে ওঠে না। তাই যখনই মনে পড়ে যাবে কোন প্রিয়জনের কথা, অথবা এমন কারো কথা যার সাথে আপনার ইখতিলাফ বা মতবিরোধ আছে, তার বা তাদের জন্য চটজলদি

দুআ করে ফেলবেন। দুআর ক্ষেত্রে উদার হোন, তাহলে যে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও একই দুআ পেয়ে যাবেন আপনি!

প্রিয়জনদের জন্য দুআ করা খুব সহজ। অথচ এটা তাদের জন্য বিশাল এক উপহার, যেটা আপনি তদের জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন অনায়াসেই। যাদের সাথে আপনার টক্কর লেগে আছে, যাদের সাথে আপনার মতের মিল হয় না, সেই মানুষগুলোর জন্যও দুআ করবেন অবশ্যই।

এটা আপনার হৃদয়ে জমে থাকা বরফকে তো গলাবেই, তাদের সম্পর্কে মনে জমে থাকা অন্যান্য খারাপ ধারণার পাহাড়কেও গলিয়ে ফেলবে ইনশাআল্লাহ। মানসিক, আধ্যাত্মিক শান্তি, নির্মলতা আর একটা বিশুদ্ধ অন্তরের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ এক অসাধারণ পদ্ধতি।

তাই আজ থেকে যখনই আপনি কাজে, ঘরে অথবা রাস্তাঘাটে যাতায়াতে থাকবেন, তখনই আপনার জীবনের সাথে নানাভাবে জড়িয়ে থাকা মানুষদের কথা স্মরণ করুন আর করে ফেলুন তাদের জন্য সুন্দর একটা দুআ।

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম ১. মুসলিম, হাদিস-ক্রম ১৯০৭ [২] মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ২৭৩২

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম। ১৯০৪; মুসলিম, হাদিস-ক্রম। ১১৫১. মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ১০৫৬৪ [২] মুখার, হাদিস-ক্রম: ৩৮: মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ৭৬০

৩। লুফে নিন সাহরির বারাকাহ

রাসূলুল্লাহ ও বলেছেন, "তোমরা সাহরি খাও, কেননা সাহরিতে রয়েছে বারাকাহ।"

অনেকেই সাহরি মিস করে ফেলেন, স্রেফ ভোরের আগে জেগে উঠে খাওয়া দাওয়া করাটা একটু কঠিন, এই কারণে। অথচ এই সময় আর এই সময়ের খাবার, দুটোর মধ্যেই রয়েছে অনেক, অনেক উপকার। যদি আপনি এই বারাকাহপূর্ণ সময়ে ঘুম থেকে উঠে পড়েন, তাহলে আপনি দুআ করতে পারবেন, কয়েক রাকআত সালাতও পড়ে ফেলতে পারেন, ইসতিগফারও করতে পারবেন ভরপুর। ইবাদাতের জন্য চমৎকার একটা সময় এটা। তাছাড়া এসময় কোন ব্যস্ততাও থাকে না আপনার। এই সময়টা আপনাকে ভরে দিতে পারে শক্তি সামর্থ্যে আর আধ্যাত্মিকভাবে আপনাকে করে তুলতে পারে পরিপুষ্ট, ভরপুর। আপনাকে দিতে পারে সামনের ব্যস্ত, অস্থির কর্মক্লান্ত দিনের জন্য শান্তির পরশ।

এছাড়াও যখন আপনি সাহরি খেতে ওঠেন, তখন আপনি আসলে আল্লাহ আর তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেন। কেননা এটা রাসূলুল্লাহ-এর একটা সুন্নাহ। শুধু তাই নয়, এটা আপনাকে পুরো দিন জুড়ে আপনার প্রোডাক্টিভিটি আর ফোকাস সর্বোচ্চ পরিমাণে ধরে রাখতে সাহায্য করবে। তাই সাহরির জন্য বেছে নিন স্বাস্থ্যকর খাবারদাবার। বিশেষ করে খেজুরও বেছে নিতে পারেন, কারণ এটা সুন্নাহ এবং খেজুরের পুষ্টিগত উপকারিতা প্রচুর।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: "খেজুর দিয়ে সাহরি কতোই না উত্তম!"

৪। মানুষকে খাওয়ানো

সবচেয়ে বেশি পুরস্কার পাবার মত যে কয়টা কাজ রাসূলুল্লাহ আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন, তার মধ্যে একটা হচ্ছে মানুষকে খাওয়ানো। এই সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণে আয়াত আর হাদিস আছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন-

"যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার জন্যও সেই রোজাদারের

(১) বুখারি, হাদিস-ক্রম। ১৯২৩: মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ১০১৫

[২] অনু দাউদ, হাদিস-ক্রম। ২৩৪৫, ইবনু হিববান, হাদিস-ম। ৩০৭৫

সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে, বোজাদারের সওয়াবে এতে কোন কমতি হবে না।"

আবেকটি হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ

একজন লোক রাসূলুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করে, "কোন কাজটা ইসলামে সর্বোত্তম?" রাসূলুল্লাহ জবাব দিলেন, "গরীব ও অভাবীদের খাওয়ানো এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।"মি

সহজে আমল করবার জন্য অসম্ভব সুন্দর একটা সুন্নাহ এটা। অন্যদের সেবা করা, মানুষকে সেবা পৌঁছিয়ে দেওয়া একটা ইবাদাত। এটা মানুষের নম্রতাকে বাড়িয়ে দেয়, স্বার্থপরতাকে কমিয়ে দেয়, অন্তরকে নরম করে তোলে।

অনেক ভাবেই এই কাজটা করা যায়। আপনি নিজের হাতে খাবার বানাতে পারেন অথবা কিনে নিতে পারেন নয়তো অভাবীদের খাওয়ানোর প্রজেক্টের। সাথে জড়িত

কারো কাছে টাকা দান করতে পারেন। যেটাই করুন না কেন, এর মাধ্যমে আপনি নিচের আয়াতেবই অনুসরণ করবেনঃ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا .

"খাবারের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে এবং বলে, আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।"

তাই মানুষকে খাওয়ানোর প্ল্যান করে ফেলুন; বিশেষ করে গরীব, অভাবী মানুষগুলোকে। যখন চোখ ভরে দেখবেন আপনার রান্না করা বা কেনা খাবারগুলো থেকে একজন গরীব মানুষ ক্ষুধায় শান্তি পাচ্ছে, তখন সেটা আপনার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধকে অনেকগুণে বাড়িয়ে দেবে আর আপনার আত্মাকে করে তুলবে সতেজ, সমৃদ্ধ।

[১] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম ৮০৭

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ১২; মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ৩৯

[৩] সূরা ইনসান, আয়াত-ক্রম: ৮-৯

৬। কুরআন হিফাযর জন্য বাস্তবসম্মত টার্গেট নেওয়া

রামাদান কুরআনের মাস। এই মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এই মাসে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি না হলে মাস শেষে এটা আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলবে।

তাই বাস্তবতার সাথে মিল রেখে প্ল্যান করে ফেলুন। কিন্তু আল্লাহর দানশীলতা আর সাহায্যকে ভুলে যাবেন না। খুব বেশি আবেগীও হবেন না, আবার একেবারে আশাও ছেড়ে দেবেন না। তিলাওয়াত আর হিফয, দুটোর জন্যই বাস্তবসম্মত একটা টার্গেট সেট করে ফেলুন, ইনশাআল্লাহ।

হতে পারে মাত্র কয়েকটা আয়াত আপনি মুখস্ত করলেন, অনুধাবন করলেন, তারপর সেটা নিজের জীবনে প্রয়োগ করলেন। আবার হতে পারে একটা পৃষ্ঠা বা একটা পুরো সূরাই মুখস্ত করে ফেললেন।

আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে, এটা কখনো বন্ধ করা যাবে না। আল্লাহর সাহায্য চাইতে থাকুন আর এই মাসটায় আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু অংশ নিজের অন্তরে গেঁথে ফেলুন। মাস শেষে নিজেকে তখন অনেক বেশি পরিপূর্ণ মনে হবে ইনশাআল্লাহ।

রাসূমুল্লাহ এবং তাঁর সাহাবীরা এই মাসে যতোটা সময় কুরআনের সাথে জুড়ে থাকতেন, আর কখনো ততোটা থাকতেন না। তাই, আপনিও গড়ে তুলুন এই মাসে কুরআনের সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক।

৭। মাতাপিতার সাথে করুন সুন্দরতম ব্যবহার

যেখানেই থাকুন না কেন, এই মাসে মাতাপিতার সাথে সম্পর্কটা আরো গাঢ় করে তোলার চেষ্টা করুন। যদি তাদের সাথে কোন কারণে মনোমালিন্য হয়ে থাকে, তবে

চেষ্টা করুন এই মাসে সেটা মিটিয়ে আবার তাদের সাথে এক হয়ে যেতে। যদি কোন সমস্যা না থাকে তাহলে চেষ্টা করুন পারস্পরিক সম্পর্কটাকে আরো সুন্দর করে তোলার আর তাদের প্রতি আপনার ব্যবহারকে যথাযথ করে তোলার।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ -এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলোঃ

"কে আমার কাছে সুন্দর ব্যবহার বেশি পাওয়ার হক্কদার? রাসূলুল্লাহ জবাব দিলেন। তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো। তারপর? তিনি বললেন: তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো। তারপর? তিনি জবাব দিলেন: আবারো তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কে? এবার রাসূলে কারীম জবাব দিলেন। এরপর তোমার বাবা।"

বাবা মায়ের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা এমন একটি শ্রেষ্ঠ আমল যেটার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ আর তাঁর রাসূল আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এই আমলের পুরস্কার সুবিশাল।

রাসূলুল্লাহ বলেছেন।

বাবা-মা হচ্ছে জান্নাতের সর্বোত্তম দরজাগুলোর মধ্যে অন্যতম, অতএব তুমি ঠিক করো, এটা থেকে ফায়দা নিবে নাকি এটাকে হারিয়ে ফেলবে।"।

তাই আবারো বলি, যেখানেই থাকি না কেন, আমরা এই মাসে আরো একটু বেশি করবার চেষ্টা করতে পারি। হতে পারে এটা বাবা মাকে দেখতে যাবার মাধ্যমে, তাদেরকে উপহার দেবার মাধ্যমে, তাদেরকে কল দেবার মাধ্যমে, তাদের কাজেকর্মে

সাহায্য করার মাধ্যমে এবং আরো অনেক, অনেক ভাবে। উপায়ের অভাব নেই। আল্লাহর সাহায্য চান যাতে তিনি আপনাকে নির্দেশনা আর প্রেরণা দান করেন।

৮। ক্বিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাত আদায় করা

আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে নিজের আবাম আয়েশকে বিসর্জন দিয়ে রাতের বেলা সালাতে দাঁড়ানো এমন একটা আমল, যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ইখলাসপূর্ণ একটা কাজ এবং একইসাথে অনেক বেশি আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একটা কাজ। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি রামাদানের রাতে ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা নিয়ে সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" ।স

যদি রাতের বেলা জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা আপনার জন্য সম্ভব হয়, তবে তাই করুন। যদি কোন কারণে সেটা করতে না পারেন, তবুও যেন এই সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যেখানেই থাকুন, ঘরে বা বাইরে, সালাত আদায় করে নিন।

ইশার নামাজের পর যেকোন সময়েই কিয়ামুল লাইল করে নিতে পারেন। ঠিক ঠিক ইশার পরেই আদায় করে ফেলতে পারেন, অথবা ইশার সালাত পড়ে ঘুমিয়ে তারপর জেগে উঠে আদায় করে নিতে পারেন। সবচেয়ে উত্তম হয় যদি আপনি ফজরের ওয়াক্তের আগে জেগে উঠে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে এই কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে পারেন। ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত যেকোন সময়েই সালাত আদায় করে নিতে পারেন, এই সবগুলোই কিয়ামুল লাইল হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, সুযোগ কিন্তু সীমিত নয় - অবারিত! আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ

রাসূলুল্লাহ বলেছেন: "কেউ যদি রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে দশ আয়াত তিলাওয়াত করে তাহলে তাকে গাফিলদের মধ্যে ধরা হবে না; যদি কেউ রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করে তবে তাকে আল্লাহর বাধ্যগত বান্দাদের মধ্যে একজন ধরে নেওয়া হবে; আর যদি কেউ রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করে তাহলে তাকে বিশাল পুরস্কৃতদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।"।২

তাহলে আপনি যদি একজন ব্যস্ত মা হন, তাহলে ভাববেন না যে মসজিদে সালাতে শরীক না হতে পেরে আপনার পুরস্কার বুঝি মিস হয়ে গেল। উল্টো ঘরে থেকে আপনার আদায় করা সালাত তো মসজিদে সালাত আদায় করার চেয়েও আরো বেশি পুরস্কৃত হবে। রাসূলুল্লাহ নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করেন নি, কিন্তু তিনি এটা তাদের উপর বাধ্যতামূলক কিংবা চাপিয়েও দেন নি। বং বলেছেন যে, ঘরে থেকে একজন নারীর সালাতকে বিশালাকারে পুরস্কৃত

করা হবে। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন; "তোমরা নারীদের মসজিদে যেতে বাঁধা দিবে না, কিন্তু ঘরই তাদের জন্য উত্তম (সালাতের

জন্য)।" [১]

তাই এই রামাদানে, সর্বাবস্থায় নিশ্চিত করুন যে রাতের সালাত আপনি আদায় করছেন। আপনার পারিপার্শ্বিকতার আলোকে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করুন। আর আমরা যাইই করি না কেন, তার মধ্যে খাইর (ধার্মিকতা আর পুরস্কার ও কল্যাণ) আছে, যতক্ষণ সেটা আমরা ইখলাস আর যথাযোগ্য প্রচেষ্টার সাথে করছি।

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ৩৭, মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ৭৫৯ [২] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম: ১৩৯৮, ইবনু হিব্বান, হাদিস-ক্রম: ২৫৭২

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম ২৫৪৮

[২] ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম। ৩৬৬৩, তিরমিযি, হাদিস-ক্রম ১৯০০, মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ২৭৫৫১

১০। সাদাকা করুন হাত খুলে

রামাদানে রাসূলুল্লাহ-এর শিষ্টাচার আর আমলের ব্যাপারে খুব সুন্দর আর শক্তিশালী একটা হাদিস বর্ণিত আছে।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

রাসূলুল্লাহ ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল এবং তাঁর এই দানের হাত আরো বেশি প্রসারিত হয়ে যেত রামাদান মাসে যখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম রামাদানের প্রতিরাতে রাসূলুল্লাহ-এর সাথে দেখা করতে আসতেন, দুজনে মিলে একসাথে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন। [১]
বুখারী হাদিস ৩২২০

তাই রামাদানে আপনার সাদাকার হাতকে প্রসারিত করতে একটি সুযোগও মিস করবেন না। অনলাইন আর অফলাইন, দুই মাধ্যমেই এই সময়ে প্রচুর সুযোগ থাকে সাদাকা করার জন্য।

রামাদানে কখন কী দুআ করবেন

গত রামাদান মাসের পর প্রায় ১ বছর অতিবাহিত হয়েছে। বিগত বছরটি ছিলো একাধারে আনন্দ, বিষাদ, উত্তেজনা, দুঃখ ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ। জীবনে ঘটে যাওয়া ভালো মন্দ নানাবিধ ঘটনায় সৃষ্ট আবেগের তাড়নাতেই আমাদের বছরটি পার করতে হয়েছে। প্রতিবছর রামাদান মাসকে আমরা আন্তরিকভাবে অত্যন্ত উষষ্ণ হৃদয়ে স্বাগত জানাই, কারণ এ মাসটি দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের ঈমান-আমলের দিকে মনোনিবেশ করার সময়। যদিও আমরা সারা বছর জুড়েই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত ও চরিত্র গঠনের জন্য কাজ করতে থাকি, তবুও রামাদান মাস হচ্ছে সেই মাস, যখন আমাদের জন্য পর্বতসম নেকি ও সওয়াব অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ বরকতময় মাসটি হচ্ছে নিজের চরিত্র গঠনের পাশাপাশি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে একান্ত সম্পর্ক স্থাপনের সময়।

রামাদান মাসের অন্যতম একটি আকর্ষনীয় নিয়ামত হলো এ মাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে মুমিনের দুআ অধিক হারে কবুল করা হয়। রামাদান মাসের দৈনন্দিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুআ নিয়ে আমরা এবারের এই নিবন্ধে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

দুআর শক্তির কথা স্মরণ রাখুন

হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেন, "তিন প্রকার ব্যক্তির দুআ কখনও ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ১. রোযাদার ব্যক্তির ইফতারের সময় করা দুআ; ২. ন্যয়পরায়ণ শাসকের দুআ; এবং ৩. মজলুম (নির্যাতিত) ব্যক্তির দুআ। ঐ দুআগুলিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেঘমালার ওপর উঠিয়ে নেন এবং এর জন্য আসমানের সবগুলো দরজা খুলে

দেওয়া হয়"। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "আমার ইজ্জতের কসম! আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব, যদিও তা কিছুকাল পরে হয়"।।।

একজন মুমিন যখন দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ কামনা করে দুআ করে, আর তা যখন কবুল হয়ে যায়, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে সে মুমিনের আর কিছুই চাইবার থাকে না। মুমিনের অস্ত্র হচ্ছে দুআ। দুনিয়ার দুঃখ- কষ্ট ও পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে দুআ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই মুমিনকে সাহায্য করতে পাবে না। দুআ মুমিন ও তার বিপদ-আপদের মাঝে দেয়াল হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়।

নবী করিম বলেছেন, "দুআই ইবাদত"। (২৯

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ বা সার"। ১০। বলেছেন, "দুআ হলো ইবাদতের মূল

যেহেতু রামাদানের বরকতময় মাস খুব সন্নিকটে, কাজেই এখন থেকেই আমাদের কিছু পূর্ব পরিকল্পনা ঠিক করে রাখা উচিত যাতে রামাদানের বরকতময় মাসের মূল্যবান মুহূর্তগুলো আমরা যতটা সম্ভব গঠনমূলক কাজে অতিবাহিত করতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হচ্ছেন আল- 'আলিম, সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। দুআ যে ভাষায়ই করা হোক না কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা বুঝতে পারেন।

তাবপরও, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এ এক অশেষ রহমত যে, তিনি আমাদের সঠিক শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে তার কাছে দুআ কবার তাওফিক দান করেছেন।

দুআকে খুব বেশী লম্বা করার প্রয়োজন নেই। হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ বলেন, "সেগুলোই কবুলযোগ্য দুআ, যাতে শব্দের আধিক্য কম থাকে এবং যা সকলের কাছে সহজে বোধগম্য।"

চাকুরীজীবি ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ নসীহাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। দুআ কতটুকু লম্বা হলো সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। মূল ব্যাপার হচ্ছে, দুআ করার পেছনে বান্দার নিয়্যত এবং দুআর মূল অর্থ।

[১] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম: ৩৫৯৮

(২) আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম: ২৯৬৯; ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম: ৩৮২৮

[৩] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম ৩০৭১

দুআ বিষায় সাধারণ কিছু নাসীহাহ

☆ রামাদান মাস শুরুর আগেই নিজের প্রয়োজন মতো দৈনন্দিন দুআগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। তালিকাটি ছোট বা বড়ও হতে পারে। এতে কোন সমস্যা নেই। তবে খেয়াল রাখবেন তালিকাটি যেন শিরোনাম অনুযায়ী ভাগ করা থাকে। এতে দুআ স্মরণ রাখা আপনার জন্য সহজ হবে।

☆ রামাদান মাসে নিজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করুন। লক্ষ্য ছোট বা বড় যাই হোক, সেগুলোর একটি তালিকা তৈরী করুন। নিজের এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের উদ্দেশ্যে

দুআ করতে ভুলবেন না। এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে সেগুলো অর্জনে সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ।

☆ দৈনন্দিন কাজের জন্য কিছু দুআ মুখস্ত করে রাখুন। নীচে সেরকম কিছু দুআ নিয়ে আলোচনা করা হলো। মুখস্ত করতে না পারলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। একটি কাগজে বা নিজের ফোনে নোট আকারে দুআগুলো লিখে রাখুন। প্রয়োজনের সময় সেখান থেকে পড়ে নিলেই হবে।

☆ ছোট ছোট কার্ডে গুরুত্বপূর্ণ দুআগুলো লিখে বাসার দেয়ালে দেয়ালে টানিয়ে দিন। এতে আপনার পরিবারের বাকি সদস্যরাও রামাদানের বরকতময় সময়ে দুআ পাঠ করার সওয়াব অর্জন করতে পারবেন। দুআগুলো হতে পারে গোসলখানায় যাওয়ার দুআ বা সিঁড়িতে ওঠার দুআ কিংবা ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ, প্রভৃতি।

দুআ করার আদব

সকল কাজেরই কিছু শিষ্টাচার বা আদব রয়েছে। যাকে সহজ ভাষায় আমরা নিয়ম-কানুন বলতে পারি। দুআ পাঠেরও তেমনি কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। আমরা যদি আমাদের দুআতে আন্তরিক ও ইখলাসপূর্ণ থাকতে চাই, তবে নীচের দিক-নির্দেশনাগুলো অনুসরন করতে পারি।

☆ দুআ কবুলের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করুন। মনে করবেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার ডাকে একদিন না একদিন অবশ্যই সাঁড়া দেবেন।

☆ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসাসূচক কোন বাক্য দিয়ে দুআ শুরু করুন। দুআর ভেতর ঘন ঘন আল্লাহর সুন্দরতম নামগুলো ধরে তাঁকে ডাকুন।

☆ দুআর ভেতব রাসূলুল্লাহ -এর নামে বারবার দুরূদ ও সালাম পেশ করুন।

☆ রাসূলুল্লাহর -এর উপর দুরূদ ও সালাম জানিয়ে দুআ পাঠ শেষ করুন।

☆ উচ্চস্বরে দুআ পাঠ করা হতে যতদূর সম্ভব বিরত থাকুন।

☆ কিবলামুখী হয়ে দুআ করুন।

সকালের যিকির-আযকারের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ সকালের আযকার

কতগুলো দুআ আছে প্রাতঃকালীন। ফজরের সালাত আদায়ের পর এ গুরুত্বপূর্ণ দুআগুলো পাঠ করার জন্য কিছু সময় অতিবাহিত করুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আরজি পেশ করুন, তিনি যেন আপনার দিনটিকে গঠনমূলক কাজে ব্যয় করার তাওফিক দান করেন, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আপনাকে সর্বদা হেফাজত করেন এবং দুনিয়ার লোভ-লালসার বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করেন।

এখানে সকালের আযকার থেকে কিছু দুআ উল্লেখ করা হলো-

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُوْرَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

আমরা সকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও সকালে উপনীত হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কামনা করি এই দিনের কল্যাণ: বিজয়, সাহায্য, নূর, রবকত ও হেদায়াত। আর আমি প্রোডাক্টিভ রামাদান

আপনার কাছে আশ্রয়। এ এ দিনের পরের অকল্যাণ থেকে। ১৯ চাই এ দিনের এবং এ

،اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي في بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণশক্তিতে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কুফরি ও দারিদ্র্য থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই।

যানবাহনে যাতায়াতকালীন কিছু সহজ দুআ ও যিকির করুন হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেন, তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ তাআলার যিকিরের দ্বারা সিক্ত থাকে। ।।

কোথাও যাতায়াতের সময় যানবাহনে বসেই আপনি কিছু একান্ত যিকির ও ছোট-ছোট দুআ পাঠ সেরে নিতে পারেন। রামাদানের সারা মাস জুড়ে এই যাতায়াতের সময় যোগ করলে কয়েক ঘণ্টা হয়ে যাবে। কাজেই, এ সময়টুকুকে আল্লাহ তাআলার যিকিরের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে হবে।

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করুন

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

| আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।

[১] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম: ৫০৮৪

[২] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম: ৫০১০

[৩] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম। ৩৬৭১, ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম ৩৭৯৩, মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম ১৭৬৮০

সকাল-সন্ধ্যায় এই যিকিবটি ১০০ বার করে পড়ুন।।। আল্লাহর কাছে জান্নাতি একটি ঘরের জন্য দুআ করুন আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্যে ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। কুবআনে। তিনি আল্লাহ তায়ালের নিকট এভাবে প্রার্থনা করেছেন-

رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

হে আমার রব! জান্নাতে আপনার নিকট আমাকে একটি। ঘর নির্মাণ করে দিন।

বিকেলের যিকির-আযকারের ব্যাপারে কিছু নাসীহাহ

উযুর পর, সিজদায় এবং ফরজ সালাতের পর এই তিন সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দুআ কবুল করা হয়। নিজের অফিসে মধ্যাহ্নভোজনের বিরতিতে বসে অল্প সময়েই যে কারও জন্যই এই যিকিরগুলো সেরে ফেলা সম্ভব। যদি আপনার দিন খুব

ব্যস্ততার ভেতর কেটে যায়, তাহলে চেষ্টা করবেন প্রতি ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায়ের পর তালিকাবদ্ধ দুআগুলো পাঠ সেরে ফেলতে।

উযুর পর দুআ করার বরকত

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে আর বলে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক সত্তা, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

এই দুআ পড়লে তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে, সে দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে।।১।

দুআ কবুলের মুহূর্তগুালাতে দুআ করুন

হযরত আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, "হে আল্লাহর রাসূল! কোন সময়ের দুআ বেশী গ্রহণযোগ্য হয়?” জবাবে তিনি বললেন, "শেষ রাতের মাঝ ভাগের এবং ফরজ নামাযগুলোর পরবর্তী দুআ"।

অফিসে বা ঘবে দৈনন্দিন কর্মরত অবস্থায় পঠিত কিছু দুআ ও যিকির

এ কাজগুলো করতেই আমাদের দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। আর রামাদান মাসে আমরা প্রায়ই এসব কাজের ব্যাপারে বিরক্তি বোধ করি। কারণ, রামাদান মাসের দৈনন্দিন ইবাদতের সাথে এ কাজগুলোর সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই, আমাদের যা করতে হবে- দৈনন্দিন এসব কাজের ভেতরেই আল্লাহর স্মরণে অন্তরকে পরিপূর্ণ রাখতে হবে। কাজে যাবার সময় আপনার দুআর তালিকটি অবশ্যই মনে করে সাথে নিয়ে নেবেন। যাতে কাজের বিরতিতে সেখান থেকে কিছু দুআ আপনি পড়ে নিতে পারেন। এছাড়া, সেসময়ই নিজের রিযিক, কাজ ও পরিবারের জন্য দুআ করার সবচেয়ে উত্তম সময়। কারণ, আপনি তখন এগুলোর মাঝেই ব্যস্ত আছেন।

অধিকহারে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করুন

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

| আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই। ।।

এ দুআটি অধিকহারে পড়ুন।

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ২৩৪

[২] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম ৩৪৯৯

[৩] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম। ৫০৯৫, তিরমিযি, হাদিস-ক্রম ৩৪২৬

[৪] আল জামিউস সাগির, হাদিস-ক্রম: ১৩৮৮

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম ২৬৯

[২] সূরা আত-তাহরীম, আয়াত-ক্রম ১১

ইলম বা জ্ঞানার্জনের জন্য দুআ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ও বলতেন, اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

"হে আল্লাহ! তুমি যে জ্ঞান আমাকে শিখিয়েছো তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কবো, আমাকে এমন জ্ঞান দান করো যা আমার উপকারে আসে, আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দাও এবং সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য"।।।

উত্তম চরিত্রের জন্য দুআ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সর্বদা এই বলে দুআ করতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَةَ وَالْعِفَّةَ، وَالأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالرَّضَا بِالْقَدَرِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্বাস্থ্য, আমানতদারি, উত্তম চরিত্র এবং তাকদিরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারার সামর্থ্যের জন্য দুআ করছি।।।

সান্ধ্যকালীন যিকির-আযকারের ব্যাপারে কিছু নাসীহাহ

সন্ধ্যার আযকার

সকালের যিকির-আযকারের মতো এমন কিছু যিকির-আযকার আছে, যা শুধু সন্ধ্যার সময়ই পাঠ করতে হয়। মাগরিবের সালাত আদায়ের পর কিছু সময় বের করে জায়নামাজে বসেই এই যিকিরগুলো সেরে ফেলতে হবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتِكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

| হে আল্লাহ। আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। আপনাকে আমি সাক্ষী রাখছি, আরও সাক্ষী রাখছি আপনার 'আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাগণকে ও আপনার সকল সৃষ্টিকে, (এর উপর) যে- নিশ্চয় আপনিই আল্লাহ, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল। ১।

ইফতারের সময় পঠিত দুআ

আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করার জন্য ইফতার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত। কাজেই, এই সুযোগ যথাসম্ভব কাজে লাগানোর জন্য সচেষ্ট থাকুন।

হযরত আবু হুরায়র। বাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ বলেন, "তিন প্রকার ব্যক্তির দুআ কখনও ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

1 রোযাদার ব্যক্তির ইফতারের সময়ের দুআ;

1 ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ, এবং

1 মজলুম (নির্যাতিত) ব্যক্তিব দুআ।

ঐ দুআগুলিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেঘমালার ওপর উঠিয়ে নেন এবং এর জন্য আসমানের সবগুলো দরজা খুলে দেওয়া হয়।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "আমার ইজ্জতের কসম! আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব, যদিও তা কিছুকাল পরে হয়।"। আরেকটি দুআকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহর দুআ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইফতারের সময় তিনি এই বলে দুআ করতেন-

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

| "তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে, ধমনীগুলো সিক্ত হয়ে গিয়েছে এবং পুরস্কারও নিশ্চিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ! মা বাবার জন্য পঠিত দুআ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

| হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব। ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে"। মুমিনকে

পরিবারের জন্য পঠিত দুআ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর"।।।

পরিবারের সবাই মিলে পঠিত দুআ

রামাদান মাস পরিবারের সকল সদস্যদের মাঝে সম্পর্কন্নোয়নের উৎকৃষ্ট সময়। বিশেষ করে, যাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্ববিদ্যালয় বা অফিসে যাতায়াত করে, তাদের জন্য একসাথে বসে ইফতার করা খুব আনন্দের। অফিসে থাকার কারণে অনেকেই দিনের বেলা ঘরে থাকে না। তাই ইফতারের সময় একসাথে খাওয়া এবং সবাই মিলে একত্রে দুআ করার ভেতর অশেষ ফযিলত রয়েছে। কাজেই, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও কিছু দুআ শিখিয়ে দিন। এতে দৈনন্দিন দুআগুলো আপনারা সবাই মিলে একত্রে পাঠ করতে পারবেন।

(১) আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম: ২৩৫৭

(২) সূরা ইবরাহীম, আয়াত-ক্রম: ৪১

[৩] সূরা ফুরকান, আয়াত-ক্রম: ৭৪

[১] আবু দাউদ হাদিস-ক্রম) ৫০৭১

[২] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম। ৩৫৯৮

[১] তিরমিযি, হাদিস-ক্রম: ৩৫৯৯, ইবনু মাজাহ, হাদিস-ক্রম ৩৮৩৩ [২] আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-ক্রম: ৩০৭

মাগফিরাতের দুআ

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষক্রটি দুর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।" ।]

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম ১১৪৫, মুসলিম, হাদিস-ক্রম ৭৫৮

[২] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ৬৩১৪

[৩] সূরা আলি-ইমরান, আয়াত-ক্রম ১৯৩

সঠিক পথ-প্রদর্শনের দুআ

"যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দুআ করেঃ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَانِ

| হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে। পূর্ণ করুন। "১

দুআ পাঠের আরও কিছু অতিরিক্ত মূহূর্ত

দিনের আরও কিছু অংশ আছে, যখন দুআ করলে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন, ইনশাআল্লাহ। সে সময়গুলোতেও আমাদের আল্লাহ তাআলার দরবারে অধিক হারে দুআ করা উচিত। মাত্র দুই মিনিটের জন্য হলেও সে সময়গুলোতে দুআ করার চেষ্টা করবেন।

জুমআর (শুক্রবার) দিনের শেষ ভাগে পঠিত দুআ

হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "জুমআর দিনের (শুক্রবার) ১২ ঘণ্টার মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কোন মুসলিম এ সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে কিছু দুআ করে তাহলে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে তা দান করেন। এ মুহূর্তটি তোমরা আসরের শেষ সময় অনুসন্ধান করো।" যে

ক্বদরের রাতে পঠিত দুআ

লাইলাতুল কদর বা কদরের বরকতময় রাত যে কারও তাক্বদীরকে সারা বছরের জন্য পরিবর্তন করে দিতে পারে। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "আমি আল্লাহর রাসূল -কে জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি জানতে পারি কদরের রাত কোনটা, তবে আমি তখন কি পড়বো?" রাসূলুল্লাহ বললেন- "বলো

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي .

হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন। য

সফরের সময় পঠিত দুআ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "তিন প্রকাবের দুআ অবশ্যই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং সন্তানের প্রতি বাবার বদ দুআ।"

রামাদান মাসে আপনার যদি কোথাও সফরে যেতে হয়, তবে সফরের সময়টুকুতে অন্য কোন কাজের পরিবর্তে তালিকাবদ্ধ দুআগুলো পাঠ করাই আপনার জন্য যথেষ্ট উপকারী হবে, ইনশাআল্লাহ। দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর কথা স্মরণ করুন এবং সেসময় তাদের জন্য বেশী বেশী দুআ করুন। আল্লাহ তাআলা যেন তাদের সবর করার শক্তি দান কবেন, যালিমের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের উপর রহমত নাজিল করেন। আপনার সফরকালীন সময়ের ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। সফরকালীন অবস্থায় কোন যদি গুরুত্বপূর্ণ দুআ পাঠের সময় হয়ে পড়ে, তাহলে দেরী না করে সাথে সাথেই তা পড়ে ফেলুন।

আশা করছি, উপরে বর্ণিত দুআগুলো রামাদান মাসের বিভিন্ন সময়ে আপনার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এবং রামাদান মাসে আপনার বরকতময় মুহূর্তগুলোকে আরও মহিমান্বিত করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম ২৫৩৮৪

[২] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম। ১৫৩৬, তিরমিযি, হাদিস-ক্রম: ১৯০৫, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস

[১] সূরা কাহফ, আয়াত-ক্রম: ১০

[২] তাখরিজু যাদিল মাআদ, ১/৩৭৯

তিনি তো ফিরিয়ে দেবেন না

সূরাহ্‌ বাকারায় রামাদান নিয়ে পরপর বেশ কয়েকটি আয়াত আছে।

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেজগারী (তাকওয়া) অর্জন করতে পারো।" (সূরাহ্‌ বাকারা ২:১৮৩)

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো,

"(রোজা রাখতে হবে) কতগুলো নির্দিষ্ট দিনে।" (সূরাহ্‌ বাকারা ২:১৮৪)

তৃতীয় আয়াতটি হলো,

"রামাদানই হলো সেই মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে......" (সূরাহ্‌ বাক্কারা ২:১৮৫)

পরপর তিনটি আয়াত সরাসরি রামাদানের ব্যাপারে। কিন্তু চতুর্থ আয়াতটি হঠাৎ করেই ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। এখানে প্রসঙ্গ হলো দুআ।

"আর (হে মুহাম্মাদ), আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, (তখন বলে দিন) নিশ্চয় আমি (আমার জ্ঞানের মাধ্যমে) রয়েছি সন্নিকটে। আমি দুআকারীর দুআর জবাব দিই যখন তারা (কাউকে আমার সাথে শরিক না করে) আমার কাছে দুআ করে।" (সূরাহ্‌ বাকারা ২:১৮৬)

আবার পঞ্চম আয়াতে সাওমের নিয়মাবলী নিয়ে কথা শুরু হয়েছে,

"রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।" (সূরাহ বাক্কারা ২:১৮৭)

প্রশ্ন হচ্ছ, সাওম প্রসঙ্গে পরপর কয়েকটা আয়াতের মাঝে হঠাৎ দুআর ব্যাপারটা কেন আসলো? অপ্রাসঙ্গিক একটি আয়াত আল্লাহ এখানে কেন বসাবেন? আসলেই কি এটা অপ্রাসঙ্গিক" না। কুরআনের সবকিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাওমের আলোচনায় দুআ সংক্রান্ত আয়াত আসার কারণ হলো আপনাকে রামাদানে দুআর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, আপনাকে জানানো যে-রামাদান হলো দুআর মাস।

এমন কিছু সময় আছে যখন দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। রামাদান এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সময়। চতুর্থ আয়াতটি আবার লক্ষ করুন,

"আর (হে মুহাম্মাদ সাঃ), আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, (তখন বলে দিন) নিশ্চয় আমি (আমার জ্ঞানের মাধ্যমে) রয়েছি সন্নিকটে। আমি দুআকাবীর দুআর জবাব দিই যখন তারা (কাউকে আমার সাথে শরিক না করে) আমার কাছে দুআ করে।" (সুরাহ বাকারা ২:১৮৬)

'এবং তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে' আর 'এবং যখন তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে' কথাটা কুরআনে ১৪ বার আছে। ইয়াস'আলুনাকা আছে ১৩ বার এবং ওয়া ইয়া ইয়াস'আলুনাকা আছে ১ বার। প্রতিবার যখন আল্লাহ বলেন 'এবং তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে', তারপরই লক্ষ্য করবেন 'কুল' (তাদের বলে দাও) কথাটা আছে। ব্যতিক্রম কেবল এই আয়াতে, এখানে দুআর কথা বলা হয়েছে। সব জায়গায় কুল আছে, খালি দুআর জায়গাটা ছাড়া। "যদি তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে" তারপর কোনো স্কুল (বলে দাও) নেই। এর মাধ্যমে আপনার কাছে বিশুদ্ধ তাওহিদের একটি বার্তা দেওয়া হচ্ছে, সেটি হলো আল্লাহর সাথে আপনার সরাসরি সম্পর্ক। আপনার

এবং আল্লাহর মাঝে না আছে কোনো বার্তাবাহক, না কোনো ওলী, এমনকি নবি (ﷺ)-ও নন। দুআ সরাসরি আপনার ও আল্লাহর মাঝে। এটিই পূর্ণাঙ্গ এবং বিশুদ্ধ তাওহিদ।

দুআর বিশেষ সময়

সকল সময়ে সকল পরিস্থিতিতে দুআর জবাব দেওয়া হয়। আল্লাহ সকল সময়ে (দিন, বাত, সন্ধ্যা) ও সকল অবস্থায় (দাঁড়ানো, বসা, শোয়া), ওযু সহকারে কিংবা ওযু ছাড়া বান্দার দুআর জবাব দেন। কিন্তু এমন কিছু সময় ও পরিস্থিতি আছে, যখন দুআ কবুলের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। দুআ কবুলের সেই ক্ষণগুলো আমাদের জেনে নেওয়া উচিত, যাতে দুআর এই মাসে আমাদের দুআগুলো যথাযথভাবে আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। শুধু এ মাসেই নয়, বছরের যেকোনো সময়, যেকোনো দিনে আমরা যেন আল্লাহর দরবারে দুআ পৌঁছানোর ব্যাপারে গাফিলতি না করি।

দুআ কবুলের বিশেষ সময়গুলো খুঁজুন। যেমন-আরাফাহব দিন, রামাদান মাস, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, বৃষ্টির সময়, ইকামাতের পর, আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময় এবং সাওম পালনকারীর দুআ। বাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে এসে বলতে থাকেন-কেউ কি আছে যার কিছু প্রয়োজন" কেউ কি আছে যে ক্ষমা পেতে চায়? এই সময় ও পরিস্থিতিগুলো যত একসাথে করতে পারা যায়, দুআ কবুলের সম্ভাবনা তত বেড়ে যায় ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণস্বরূপ, রামাদান মাসে, লাইলাতুল কদরে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে সিজদারত অবস্থায় করা দুআ। কত চমৎকার এক সুযোগ। বিশেষ সময় আর বিশেষ পরিস্থিতি। এমন দুআ কি বৃথা যেতে পারে?

দুআর আনুষ্ঠানিকতা

আপনি যেকোনো সময় যেকোনো অবস্থায় দুআ করতে পারেন। কিন্তু মাঝেমাঝে আনুষ্ঠানিকতাগুলোও পালন করুন। যেমন- মাঝেমাঝে ওযু করে দুআর পরিকল্পনা করুন। ব্যাপারটাকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা হিসেবে চিন্তা করুন। ওযু করে দুই বাকাত সালাত পড়ে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দুআ করুন। সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে রাসূল (৬) একবার হাত এত উঁচু করেছিলেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃশ্যমান হয়ে গিয়েছিল। কখনো তিনি বুক পর্যন্ত হাত উঁচু করেছেন, কখনো আঙুল তুলে দুআ করেছেন। আর হ্যাঁ, আঙুল তুলে দুআ করায় কোনো সমস্যা নেই।

কেউ যখন দুআ করার জন্য হাত তোলে, তখন চিরঞ্জীব ও সম্মানিত মহান আল্লাহ তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। তিনি কখনোই আপনাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবেন না।

আবু দাবদা (৬) বলতেন, "তোমার হাতগুলো শিকলবন্দী হয়ে যাওয়ার আগেই সেগুলো আল্লাহর কাছে উঁচু করো।"

অতি উচ্চ ও অতি নিম্ন স্বরে দুআ না করা

বুখারি ও মুসলিমে এসেছে একবার সাহাবিরা যখন জোরে শব্দ করে দুআ করলেন, নবিজি (খ) বললেন "তোমরা তো কোনো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না।।২৯) একইভাবে কুরআনে আছে

"সালাতে তোমার কণ্ঠস্বর অতি উচ্চ বা অতি নিচু কোরো না, বরং মধ্যবর্তী পন্থা অনুসরণ করো।" (সূরাহ আল ইসরা ১৭:১১০)

"বিনয় ও গোপনীয়তা সহকারে তোমাদের রবকে ডাকো।" (সূরাহ আল- আরাফ ৭:৫৫)

এই আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে বেশি জোরে বা বেশি আস্তে না বলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে। এটি দুআর আদবসমূহের একটি। যাকারিয়া (৪৪)-এব কণ্ঠস্বর মধ্যম পর্যায়ে রাখার কারণে আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেছেন

"যখন সে তার রব্বকে ডাকল নিভৃতে।" (সূরাহ মারইয়াম ১৯:৩)

[২৪] মুসলিম: ৭০৩৭

ছন্দে ছন্দে দুআ না করা

আকে একেবারে কবিতার মতো করে ফেলা উচিত নয়। স্বাভাবিকভাবে এমনটা হয়ে গেলে সমস্যা নেই, কিন্তু ইচ্ছা করে এমনটা করা যাবে না। বাংলা বা ইংরেজিতে এরকম ছন্দ মেলানোর ব্যাপারটা না থাকলেও, আরবিতে এরকম দেখা যায়। আরবিতে একে বলে সাজা', যখন ছন্দ মিলিয়ে দুআ করার বাড়াবাড়ি রকম চেষ্টা করা হয়। আল্লাহ বলেন

"তোমার রব্বকে বিনয় সহকারে নিভৃতে ডাকো। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরাহ আল আরাফ ৭:৫৫)

দুআর ক্ষেত্রে দৃঢ়চেতা হওয়া

আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করবেন-এ কথা জেনে দৃঢ় সংকল্প সহকারে দুআ করুন। সুনান আত-তিরমিযিতে আছে,

-আল্লাহ তোমার দুআর জবাব দেবেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আল্লাহকে ডাকো। তবে সে সাথে এটাও জেনে রাখো যে, গাফেল অন্তরের দুআর জবাব দেওয়া হয় না।শল

যখন দুআ করবেন, দৃঢ় থাকবেন এবং মন দিয়ে দুআ করবেন। নিশ্চিত থাকবেন এই ভেবে যে আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করবেন। এমনভাবে দুআ করবেন না যে, 'হে আল্লাহ আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন।' বরং বলবেন, 'হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।' দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে- আল্লাহ আপনাকে মাফ করবেন। দুআ কবুলের ব্যাপারে মনে দ্বিধা রাখবেন না। আল্লাহ শয়তানের দুআ কবুল করেছেন, আর তিনি আপনার দুআ কবুল করবেন না? শয়তান দুআ করেছিল তাকে যেন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়।

"(ইবলীস) বলল, "আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (আল্লাহ) বললেন, "তুই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরাহ আরাফ ৭:১৪-১৫)

আপনি তো শয়তানের চেয়ে নিকৃষ্ট নন। আমরা যা-ই করি না কেন, শয়তানের চেয়ে আমরা বেশি খারাপ নই-যদিও আমাদের পাহাড়সম পাপ থাকে। যে আল্লাহ শয়তানের দুআ ফিরিয়ে দেননি, তিনি কি আমাদের দুআ ফিরিয়ে দেবেন?

এমনকি অবিশ্বাসীরাও (মুশরিক) একটা সময় সৎভাবে আল্লাহকে ডাকে, যাতে তিনি সাড়া দেন।

[২৫] তিরমিযি, ৩৪৭৯

"আর যখন তারা কোনো জলযানে আরোহণ করে, তারা আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন নিরাপদে তাদের স্থলে পৌঁছে দেন, তারা তাঁর সাথে অন্যদের শরিক করতে থাকে।" (সূরাহ আনকাবুত ২৯:৬৫)

মহাসাগরের স্রোত ও বাতাস যখন তাদের ডুবিয়ে দিতে উদ্যত হয়, তারা এক আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। শির্ক পরিত্যাগ করে কিছু সময়ের জন্য এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তারা আগেও আল্লাহর সাথে শির্ক করেছে, আর আল্লাহ জানেন যে তাদেরকে নিরাপদে তীরে পৌঁছে দেওয়ার পর আবার তারা এ কাজ করবে। তারপরও যখন তারা ইখলাসের সহিত আল্লাহকে কিছু সময়ের জন্য ডেকেছে- আল্লাহ তাদের দুআ কবুল করেছেন। তিনি যদি অল্প সময়ের জন্য খালেসভাবে দুআ করা মুশরিকদের দুআ কবুল করে থাকেন, তাহলে কি তাওহিদের অনুসারীদের দুআ তিনি ফিরিয়ে দেবেন?

দুআতে লেগে থাকুন

ক্রমাগত দুআ করতে থাকুন। যখন দুআ করবেন, বারবার বারবার করবেন, আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি ও ভিক্ষা করবেন।

সহিহ মুসলিমে আছে, নবিজি (ﷺ) কোনো দুআ তিনবার করে করতেন। ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) বলেন যে, "তিনি তিনবার করে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন।" দুআ এভাবেই করা উচিত এবং নিয়মিত করা উচিত। রাতারাতি দুআ কবুল না হয়ে গেলেও হাল ছেড়ে দেবেন না। বরং দুআর পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিন। কখনো এমনটা বলবেন না যে-আমি এত দুআ করলাম অথচ আল্লাহ কবুল করলেন না। এভাবে করলে আপনি নিজেই নিজের দুআকে ধ্বংস করে ফেলবেন।

বুখারি ও মুসলিমে আছে, "তোমাদের কেউ দুআ কবলে তার জবাব ততক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হতে থাকে যতক্ষণ না সে অধৈর্য হয়ে বলে, 'আমি দুআ করেছি কিন্তু তা কবুল হলো না।'"।] সালাফদের মাঝে দেখা যায়, কেউ ২০ বছর ধরে একটা জিনিস চেয়ে তা পাননি, তারপরও তাঁরা আশা ছাড়েননি, এরপরও তাঁরা দুআ করে গেছেন এই আশায় যে-একদিন আল্লাহ তাঁদের দুআ কবুল করবেন।

দুআর শুরু, মধ্যভাগ ও শেষে নবিজি)ﷺ(-এর প্রতি দরূদ পড়ুন

দুআর শুরু ও শেষে নবি (৬) এর প্রতি দরূদ পাঠ করুন এবং দুআর মাঝেও কোনো দরূদ পাঠ করুন। আবু সুলায়মান আদ দারানি একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নবি (8)-এর উপর দরূদ পড়ে দুআ শুরু করুন এবং দরূদ পড়ে দুআ শেষ করুন। কেন? নবির প্রতি দরূদ পড়লে তা এমনিই কবুল হয়। আর আল্লাহ কোনো মুআর শুরু ও শেষের অংশ কবুল করে মাঝের অংশ প্রত্যাখ্যান করবেন- এমনটি হতে পারে না।

সবসময় দুআর শুরু, মধ্যভাগ ও শেষে নবিজি (জ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করুন। সহিহ তিরমিযি ও তাফসীর ইবনু কাসিরে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে যে, উমর (৩) বলেন, আসমান ও জমিনের মাঝে দুআ আটকে থাকে, নবি (জ)-এর উপর দরূদ না পড়া পর্যন্ত সেই দুআ আসমানে পৌঁছে না। এটি অবশ্য উমর (৬) এর ব্যক্তিগত অভিমত হতে পারে। কারণ তিনি বলেননি যে, রাসূল (৬) এটি বলেছেন। তবে এ ধরনের কথা রাসূলুল্লাহ (৬) এর ওপরে আরোপযোগ্য, কারণ এগুলো দ্বীন সংশ্লিষ্ট বিষয়। এটা হতে পারে না যে, দ্বীনের ব্যাপারে উমর (৬)-একটা কথা বানিয়ে নিয়ে আসবেন। এই ধরনের কথা বা হাদিসের বিষয়ে এটাই বিধান।

শুআবুল ঈমানে ইমাম বায়হাকি একই রকম একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন আলি (৬)-এর বরাতে। তিনি বলেছেন, আলি (৩) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৬) এর প্রতি দরূদ পাঠ না করলে সকল দুআ কবুল হয় না। এই একই হাদিস আলি (৩) এর বরাতে বর্ণনা করেছেন বাকী ইবনু মাখলাদ এবং সেটাকে মারফু হিসেবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ, বাজী ইবনু মাখলাদের মতে এই উক্তিটি রাসুলুল্লাহ (৪)-এর। বাকী ইবনু মাখলাদ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এক কয়েদির জন্য দুআ করেছিলেন এবং সেই দুআ কবুল হয়েছিল। তাঁর দুআয় সেই কয়েদির শিকলগুলো একটির পর একটি ভেঙে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে মুক্ত হয়ে যায়। তখন তাকে বলা হয়-নিশ্চয়ই তোমার মুক্তির জন্য কেউ একজন দুআ করছিল।

[২৬] বুখারি: ৬৩৬০, মুসলিম ৭১১০

রামাদানের শেষ দশ দিন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুকুমে জান্নাত আমাদের জন্য নিজেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে চলেছে প্রতিনিয়ত। আর রাহমান আল্লাহ রাববুল ইযযাত প্রতি মুহূর্তে আমাদের উপর তাঁব রহমত আর করুণাধারা বর্ষণ করছেন। আল্লাহর এই রহমত পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যেন কোনো নেতিবাচক চিন্তা কাজ না করে, বরং যাবতীয় অলসতা ঝেড়ে ফেলে আমাদেরকে আল্লাহর রহমতের আশায় নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত এই যে, তিনি রামাদানের শেষ দশদিন আমাদের জন্য সব থেকে উত্তম দিন বানিয়েছেন। এই শেষ দশদিন হলো এমন কিছু সময়, যখন নিজেদের আত্মার সমৃদ্ধি এবং পরিচর্যার জন্য বেশি জোর দিতে হবে। নিজেদের শরীরের আরামটুকু থেকে কিছু অংশ আত্মিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করাটা আমাদের জন্য খুব জরুরি।

সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে আইশা (৬) বলেছেন, রামাদানের শেষ দশদিনে রাসূল (৯) তাঁর সকল স্ত্রীদের রাতের বেলায় ডেকে তুলতেন। নবিজি (*) কিন্তু স্ত্রীদের রান্না-বান্না অথবা নিজের কোনো ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য ডেকে তুলতেন না। রামাদানের শেষ দশদিন তিনি নিজেও সারা রাত ইবাদাত করতেন এবং তাঁর স্ত্রীরাও সারা রাত ইবাদাতে কাটাতেন। সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে "নবিজি রামাদানের শেষ দশদিন বছরের অন্য যেকোনো সময় থেকে বেশি ইবাদাত করতেন।" সহিহ বুখারিতে আছে আইশা (৩) বলেছেন, "রামাদানের শেষ দশদিন শুরু হবার সাথে সাথে নবিজি (৪) কোমর বেঁধে ইবাদাতে নেমে পড়তেন এবং উনার নিজের পরিবারবর্গকেও সারারাত জেগে ইবাদাত করতে বলতেন।" কোমর বেঁধে ইবাদাতে নেমে পড়া বলতে আসলে অত্যন্ত আগ্রহ, উদ্দীপনা আর উৎসাহ নিয়ে ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করা বোঝানো হচ্ছে।

অনেক আলিম বলেছেন, কোমর বেঁধে নেমে পড়া কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হলো, রামাদানের শেষ দশ দিন স্ত্রীদের সাথে নবিজি (ﷺ)-এর কোনো সম্পর্ক থাকত না। আসলে শেষ দশদিন তিনি ইবাদাতে এতটাই মশগুল এবং ব্যস্ত থাকতেন যে-উনার স্ত্রীদের কাছে যাবার সময়টুকু পর্যন্ত পেতেন না। এটা সুফিয়ান আস-সাওরি (এ)-এর মত এবং উনার এই মতটাই অধিক উত্তম। কারণ অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (জ) রামাদানের শেষ দশ দিন তাঁর বিছানাপত্র গুছিয়ে নিতেন এবং ইবাদাতে এত বেশি মশগুল হয়ে যেতেন যে, তাঁর স্ত্রীদের সাথে কোনোরকম সম্পর্কই থাকত না। স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো অবশ্যই হারাম কিছু নয়, কিন্তু নবিজি রামাদানের শেষ দশ দিন এত বেশি ইবাদাত করতেন যে, স্ত্রীদের সাথে পর্যন্ত তখন উনার সম্পর্ক থাকত না।

ইবনু রজব (৬) বলেন, "নবিজি (জ) রামাদানের প্রথম বিশদিন স্ত্রীদের সাথে ইসলামে অনুমোদিত সবকিছুই করতেন, আর শেষ দশ রাতে উনি এতটাই ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন যে পরিবারের সাথেও তাঁর সম্পর্ক থাকত না।" চিন্তা করুন, এই যদি হয় আমাদের রাসূল (ﷺ)-এর ইবাদাতের দৃষ্টান্ত, যিনি আল্লাহ তাআলার আযাবের ভয়ে সবসময় ভীত থাকতেন, যার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, এবং যিনি ছিলেন আল্লাহর সব থেকে কাছের এবং পছন্দের মানুষ - তাহলে আমাদের কী করা উচিত-যেখানে আমাদের গুনাহ মাফ হবে কি না আমরা তা-ই জানি না? আমরা যদি নবিজি (৯)-কে আমাদের সাধ্যমতো অনুসরণ না করি, তবে সেটা তো আমাদের নিজেদের সাথেই প্রতারণা করা হবে। অন্তত রামাদানের শেষ দশ দিন আমাদের উচিত নবিজি (৬)-কে নিজেদের সাধ্যমতো অনুসরণ করা। এটা নিজের প্রতিই অবিচার করা হবে, যদি কেউ রামাদানের শেষ দশদিনের এই বিশাল সুযোগ কাজে না লাগায়। যদি এই বরকতময় সময় কাজে লাগাতেই কেউ আলসেমি করে, তাহলে সেই অলস ব্যক্তি আসলে ঠিক কোন দিনগুলোর সুযোগ নেবার অপেক্ষায় বসে

আছে? তবে কি সে এমন দিনের অপেক্ষায় আছে যখন তাকে কবরে শুয়ে শুয়ে আফসোস করতে হবে?

ইবনু রজব।) বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে যে, রাসূল (৬) শেষ দশদিন এমনভাবে ইবাদাতে মশগুল থাকতেন, যা তিনি বছরের অন্য কোনো সময়ে থাকতেন না। শেষ দশদিন তিনি রাত জেগে সালাত আদায় করতেন, যিকিরে মশগুল থাকতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কাজেই আপনিও যে ইবাদাত করে প্রশান্তি অনুভব করেন এবং যে ইবাদাত করলে আপনার মনে হয় যে, আপনি আল্লাহর কাছাকাছি আসতে পারছেন-সেই ইবাদাতেই মশগুল হয়ে যান। যদি মনে করেন যিকির করে প্রশান্তি পান, তবে যিকিরে মশগুল হন। যদি কুরআন তিলাওয়াতে প্রশান্তি পেয়ে থাকেন, তবে কুরআন তিলাওয়াতে নিজেকে ঢেলে দিন। যদি সালাত আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াতে প্রশান্তি পান, তবে এই দুই ইবাদাতেই নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, কোন ইবাদাত বেশি উপযোগী? আসলে আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন মানুষের স্বভাব সম্পর্কে, তাই তিনি ইবাদাতের বিভিন্ন পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। কারো কাছে যেটা করতে অনেক ভালো লাগে, সেটা আবার অন্য একজনের কাছে ততটা ভালো না-ও লাগতে পাবে। যেমন- সালাতের ক্ষেত্রে রাকাত সংখ্যার ভিন্নতা আছে, দু-রাকাত, তিন-বাকাত এবং চার রাকাত এরকম। অনেক সালাতে কিরআত জোরে জোরে পড়া হয় আবার কিছু সালাতে নীরবে পড়তে হয়। কিছু ইবাদাত ফরয, যা আমাদের অবশ্যই করতে হবে-আবার কিছু ইবাদাত নিজের ইচ্ছেমতো করা যায়। তাহলে ইবাদাতের সব থেকে ভালো উপায় কোনটা? আসলে যে ইবাদাত করে আপনি নিজের অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করেন এবং যে ইবাদাত নিজের অন্তরের প্রশান্তির পাশাপাশি আল্লাহ তাআলাব খুব কাছাকাছি যাবার শক্তি এবং সুযোগ করে দেয়-আপনার জন্য সেই ইবাদাতই সবচেয়ে উপযোগী।

লাইলাতুল কদরের কিছু বিশেষ দুআ আছে, যা আমরা পড়তে পারি। লাইলাতুল কদরে সারারাত জেগে ইবাদাতে মশগুল হয়ে থাকাটা নবিজি (ﷺ)-এর সুন্নাহ, সূতরাং আমরা নিজেরা এবং নিজেদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে এই সুন্নাহটুকু পালন করব ইনশাআল্লাহ। সুফিয়ান আস-সাওরি।) বলেছেন, "যখন রামাদানের শেষ দশ রাতের আবির্ভাব হয়, তখন যেন আমরা নিজেরা ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর ইবাদাত করি এবং নিজেদের পরিবারের সদস্যদেরও জাগিয়ে তুলি যেন তারাও এই ইবাদাতে শামিল হতে পারে, কারণ এই কাজের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে আমরা পুরস্কৃত হব।"

ইবনু বাত্তাল (৪) বলেন, এটা হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, রামাদানে ও রামাদানের বাইরেও ইতিকাফ করা সুন্নাহ। ইতিকাফ ভুলে যাওয়া সুন্নাহগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং আপনি যত বেশি এরকম ভুলে যাওয়া সুন্নাহগুলো পালন করবেন, তত বেশি আপনি পুরস্কৃত হবেন, কারণ এর মাধ্যমে আপনি একটি সুন্নাহকে পুনর্জাগরিত করছেন। ইবনু মুনযির এবং শিহাব বলেন, "এটা খুবই বিস্ময়কর যে, মুসলিমরা ইতিকাফ ত্যাগ করেছে অথচ নবিজি (ﷺ) মদিনায় আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও ইতিকাফ ত্যাগ করেননি।"

আবু হুরায়রা (৬) ও আইশা (৯) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নবিজি (ﷺ) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি বছর ইতিকাফ করেছেন। তিনি রামাদানের প্রথম দশদিনে ইতিকাফ করেছিলেন, তারপর তিনি রামাদান মাসের দ্বিতীয় দশদিনে ইতিকাফ করেছিলেন এবং তারপর তিনি রামাদানের শেষ দশদিনেও ইতিকাফ করেছিলেন, আর শেষ দশদিনে আমাদেরকে এটি করতে বলেছেন। এটাই রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ, যা তিনি মৃত্যু পর্যন্ত করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি রামাদান মাসে নবিজি (ﷺ)-এর কাছে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, কোনো কারণে ইতিকাফ মিস হয়ে গেলে পরবর্তী মাস শাওয়ালের প্রথম দশদিনে এটি পালন করতেন। যে বছর তিনি মারা যান, সেই বছর সহ মোট বিশ বছর ইতিকাফ পালন করেছেন। ইবনু হাজার বলেন, "এক বছর সফরে

থাকায় তিনি একটি ইতিকাফ মিস করেন, তাই পরবর্তী মাসে এটি পালন করেন। তিনি লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করার সময়ে ইতিকাফ করতেন।"

ইতিকাফ আপনাকে দুনিয়াবি সব কিছু থেকে এবং সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করায়। আপনাকে আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। যত বেশি আল্লাহকে জানবেন, তত বেশি আল্লাহকে ভালোবাসবেন এবং আল্লাহর প্রতি আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন, আর আল্লাহকে যত বেশি ভালোবাসবেন তত বেশি দুনিয়ার সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর সাথে যুক্ত হতে চাইবেন। একজন সালাফ তাঁর বেশিরভাগ সময় ব্যয় করতেন তাঁর ঘরে। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনি কি একা বোধ করেন না?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি কী করে একা অনুভব করতে পারি, যখন আমি ক্রমাগত এমন একজনকে স্মরণ করি যিনি আমাকে স্মরণ করেন!" এটা হলো যোগাযোগ-অত্যন্ত শক্তিশালী এক সম্পর্ক। আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক সরাসরি আপনার অন্তরের সাথে জড়িত এবং ইতিকাফ আপনার এই অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। সাওম পালন আপনাকে খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে বিরত রাখে, আর ইতিকাফ আপনাকে অত্যধিক কথাবার্তা এবং অত্যধিক ঘুম থেকে বিরত রাখে। বন্ধু, পরিবার এবং অন্যান্য বিষয় যা আপনার মনোযোগে সামান্যতম বিঘ্ন ঘটায় সেগুলো থেকে দূরে রাখে। আল্লাহর সম্পূর্ণ আনুগত্য এবং আল্লাহর সাথে দৃঢ় সংযোগ থেকে এগুলো আপনাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, আর ইতিকাফ সমগ্র দুনিয়াকে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে এক আল্লাহর দিকে আপনাকে দ্রুত নিকটবর্তী করে দেয়।

আজ মানুষ ইতিকাফ করতে মসজিদে যায়, কিন্তু ইতিকাফের আসল উদ্দেশ্যকে বুঝতে ব্যর্থ হয়। তারা সেখানে ঘুরে বেড়ায়, কথা বলে এবং ইতিকাফের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। মনে রাখবেন, আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন, যাতে

আপনি তাদের সাথে কথা বলতে না পারেন এবং আপনার কোনো পার্থিব সংযোগ না থাকে। আপনি দুনিয়াবি সব কিছু এবং যেসব ব্যাপার আপনাকে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে বাধা দিচ্ছিল, সেসব পেছনে ফেলে ইতিকাফে অগ্রসর হোন। ইতিকাফ আপনাকে সমস্ত দুনিয়াবি ব্যাপার থেকে বিরত রাখে এবং সর্বোত্তম স্থানে অর্থাৎ মসজিদে একটি নির্দিষ্ট সময় জুড়ে আল্লাহর নিকটবর্তী করে রাখে।

"(তাঁর আলোর পথ অবলম্বনকারী) ঐ সব ঘরে পাওয়া যায়, যেগুলোকে উন্নত করার ও যেগুলোর মধ্যে নিজের নাম স্মরণ করার হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন। সেগুলোতে এমন সব লোক সকাল সাঁঝে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।" (সূরাহ আন নূর ২৪:৩৬)

ইমাম আহমাদ (৯) বিশেষভাবে বলেছিলেন, "মুমিনদেরকে লোকদের সাথে মিশ্রিত হওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে, এমনকি দ্বীনের শিক্ষা কিংবা নসিহত দেওয়ার মতো ব্যাপার হলেও তাতে জড়ানো যাবে না।"

একা থাকুন, আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক মজবুত করুন এবং নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তুলুন। যারা কারাগারে ছিল, বিশেষ করে যাদের কারাগারের নির্জন সেলে রাখা হয়েছিল, তাদের সবচেয়ে ভালো সময় কেটেছে নির্জন সেলে থাকাকালীন, কারণ ঐ সময়ে তারা সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু আল্লাহর সাথেই সংযোগ স্থাপন করেছে। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে। যে কেউ অন্যকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসার মানুষের সাথে একা থাকতে পছন্দ করে-এটাই বাস্তবতা। যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে আল্লাহর সাথে একা সময় কাটাতে ভালোবাসবে। এতটুকু জানার পর আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি, আমরা কি আসলেই আল্লাহকে ভালোবাসি? ইতিকাফ অন্তবকে পুরোপুরি আল্লাহর দিকে

ফিরিয়ে নেয়ার জন্য একটি ট্রেনিং সেশন। ইতিকাফ দুনিয়ার সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করায়।

রামাদানের শেষ দশ রাতের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। আমাদের সালাফরা যৌবনে থাকতেই বলতেন যে, "আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আমরা দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছি।" এমন নয় যে তাঁরা বৃদ্ধ বয়সের উপনীত হওয়ার পর আল্লাহর ইবাদাতে মনোনিবেশ করেছেন, বরং যুবক থাকতেই তাঁরা নিজেদের সবকিছু দিয়ে আল্লাহর ইবাদাতে আত্মনিযোগ করেছিলেন। সালাত, আল্লাহর যিকির ও প্রশংসা, কুরআন তিলাওয়াত, সাদাকা সহ কুরআন হাদিস অনুযায়ী যত ধরনের ইবাদাতের কথা আপনার মাথায় আসবে, সেই সকল ইবাদাতে নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। রামাদানের শেষ দশ রাতের মধ্যেই আছে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত রাত-যা হাজার বাত অপেক্ষা উত্তম-যে বাতেই কুরআন নাযিল হয়েছিল। নিজের বিশ্রাম এবং ঘুম সংক্ষিপ্ত করুন, অলসতা ঝেড়ে ফেলুন এবং আল্লাহর ইবাদাতের জন্য বিনয়ের সাথে উঠে দাঁড়ান। নিজের উৎসাহ আর উদ্দীপনাকে উজ্জীবিত করুন আর সব ধরনের ঢিলেমিকে বিদায় জানান, কারণ আপনি এখন ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবিদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবেন। আমরা চাই, জান্নাতে যখন সাহাবিদের সাথে আমাদের দেখা হবে, তখন যেন তাঁরা আমাদের দেখে বুঝতে পারেন যে, তাঁদের পরেও দুনিয়াতে এমন বান্দা ছিল যারা ইবাদাতে তাঁদের সমকক্ষ হয়েছিল।

রামাদানের শেষ দশ দিন যেন রামাদানের প্রথম বিশ দিনের মতো না হয়। আপনার রামাদান যেন বছরের অন্যান্য আর সাধারণ দিনের মতো চলে না যায়। শেষ দশ দিনে আপনাকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে পূর্বের সকল মাইলফলক অতিক্রম করতে হবে, অর্থাৎ রামাদানের শেষ দশ দিনে, রামাদানের প্রথম বিশ দিনের সম্মিলিত ইবাদাতের থেকেও বেশি ইবাদাত করতে হবে।

আমরা কেউই জানি না আমরা পরের রামাদান পাব নাকি তার আগেই আমাদের অন্ধকার করবে আশ্রয় নিতে হবে। আমরা তো এটাও জানি না কবরে আমাদের অবস্থা কেমন হবে। রামাদানের এই সময়গুলোর মতো আমাদের জীবনও এভাবেই শেষ হয়ে যাবে। মুমিন এবং পাপী উভয়েই চলে যাওয়া সময় নিয়ে আফসোস করবে। মুমিনরা এই ভেবে আফসোস করবে যে, কেন সে আরও বেশি ইবাদাত করল না, আর পাপী আফসোস করবে কেন সে আল্লাহর দিকে ফিরে এলো না। কাজেই আল্লাহর ইবাদাতে দ্রুততার সাথে এগিয়ে আসুন, তাহলে আল্লাহও আপনার দিকে দ্রুততার সাথেই এগিয়ে আসবেন।

কুরআনের সাথে এ বন্ধন অটুট থাকুক রামাদানের পরেও

যখন রামাদান আমাদের ছেড়ে চলে যায়, তখন আমাদেরকে একটা শূন্যতায় পেয়ে বসে। অনেকেই হয়তো রামাদানে দুর্দান্ত একটা সময় কাটান আর রামাদানের পর এই হতাশায় ভুগেন যে কীভাবে কীভাবে তারা রামাদানের বারাকাহপূর্ণ দিনগুলি পার করে ফেললেন। রামাদানের এই ঝড়ের বেগে চলে যাওয়া বিশ্বজুড়ে যে কোন মুসলিমের হৃদয়কেই ব্যাথাতুর করে তোলে। কিন্তু কোন জিনিসটা আসলে আমাদেরকে ব্যথিত করে তোলে? এটা কি ইফতারে ভুড়িভোজনের সময় শেষ হয়ে যাওয়া? নাকি এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর ভয়ের কিছু?

ভয়টা আসলে হচ্ছে কুরআনের সাথে সম্পর্কটা রক্ষা না করার। এটি আসলেই ভয়ের ও আশংকার ব্যাপার যে ঈদের ব্যস্ততা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আমরা রামাদানের আমল পরিত্যাগ করে ফেলি, কুরআনের সাথে সম্পর্ক কমিয়ে ফেলি।

ব্যাপারটাকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, সৈনিকরা কোন যুদ্ধে জিততে চাইলে তাদেরকে অবশ্যই যুদ্ধের আগে প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের যুদ্ধটা হচ্ছে কুরআনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার যুদ্ধ। আমাদের লড়াই হচ্ছে রামাদানের অর্জনের ওপর দাঁড়িয়ে এই সম্পর্ককে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াই। তাই আমাদের জন্য রামাদানে করা ভুল থেকে শেখা আর আগামী মাসগুলোতে কুরআনের সাথে শক্তপোক্ত একটা সম্পর্কের সূচনা করাটা খুব জরুরি।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

"যে বাড়িতে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় না সেটা যেন একটা পরিত্যক্ত বাড়ির মত, যার দেখাশোনা করবার কেউ নেই।"

তখনো আপনার বাড়িকে পরিত্যক্ত বাড়ির মত বানিয়ে ফেলবেন না। যতক্ষণ ধর্যন্ত আপনার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কুরআন আর তার শিক্ষাকে শরু করে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম। কতদিন আছে আমাদের হাতে সে হিসেব বাদ দিয়ে নিজেদের আত্মার যত্ন নেওয়াটা জরুরি। আমরা নিজেদের সুগন্ধময় করে তুলতে, দেখতে ফিটফাট করতে আর ভালো খাবার খেতে যথেষ্ট সময় খরচ করি, কিন্তু আমাদের আত্মার পরিচর্যা করতে ভুলে যাই। অথ্য, আত্মার দিকেও নজর দেয়া উচিত, আত্মাকেও সুগন্ধময়, পরিপাটি রাখতে হবে এবং উত্তম খাদ্য খাওয়াতে হবে। আর আত্মা তো পরিপুষ্ট হয় একমাত্র কুরআনের মাধ্যমে। মানবদেহ নশ্বর, ভঙ্গুর ও দুর্বল। আপনি যদি আপনার আত্মাকে কুরআনের দ্বারা নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করে তুলতে পারেন তাহলে যখন আপনার শরীরটা দুর্বল হয়ে যাবে, তখন আপনার আয়ার বলেই আপনি আমলে অগ্রগামী থাকতে পারেন। অতএব, আত্মাকে খাবার দিন যাতে আপনার হৃদয় মরে না যায়।

এখানে এমন ১০টি পরামর্শ আমরা দিতে যাচ্ছি, যা মেনে চললে আপনি রামাদানের পরেও কুরআনের সাথে একটা মজবুত সম্পর্ক শুরু করতে, সেটার বিকাশ ঘটাতে এবং সেটা বজায় রাখতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ, তা সে যতোই ব্যস্ততা আপনার থাকুক না কেন।

১। প্রতিটি মাসকে রামাদানের মতোই বিবেচনা করা

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ

وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ .

"আর আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ।"

রামাদানের বারাকাহ ভবা দিনগুলো চলে যাবার সাথে সাথেই ইবাদাতের প্রতি আমাদের মানসিকতা বদলে ফেলা উচিত নয়। উপরোক্ত আয়াতটি প্রতিটি দিনের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। কুরআনের সাথে কাটানোর জন্য রামাদান বিশেষ একটা সময়। কিন্তু এর মানে এই না যে, রামাদানের বাইরে অন্যান্য মাসে আমরা কুরআনকে অবহেলা করতে শুরু করে দিব।

রামাদানের ব্যাপারে আপনার বছরে একবার চূড়ান্ত আমলের প্রদর্শনী করে ফেলার ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে এই মাসকে দেখুন সমগ্র বছরের জন্য প্রশিক্ষণ হিসেবে, সারা বছর প্রতিদিন আপনি কী করতে পারেন তার একটি আভাস হিসেবে। সিয়ামরত থাকা অবস্থায় আপনি কী কী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন আর এখন রামাদানের বাইরে এসে আপনি কী কী করতে পারবেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করে দেখুন।

কখনো কখনো দৈনন্দিন জীবনের ঝামেলার মধ্যে কুরআনকে সময় দেওয়াটা একটা অতিরিক্ত বোঝার মত মনে হতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى

"আপনি কষ্ট-ক্লেশে পতিত হন- এ জন্য আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি।"

কুরআনকে আপনার প্রয়োজন হিসেবে দেখতে নিজের মানসিকতাকে সেভাবে ঠিক করে নিন। এই পরিবর্তন সন্দেহাতীতভাবে আপনাকে শান্তি আর তৃপ্তি এনে দেবে। সত্যটা হল, যেকোন দিনই আমাদের জন্য শেষ দিন হতে পারে আর এই দিনটিই

শুধুমাত্র আমরা আখিরাতের জন্য বিনিয়োগ করতে পারি। এই জীবনে পাওয়া বাকি সবকিছুর তুলনায় এই বিনিয়োগটুকুই বহুগুণে দামী।

২। লক্ষ্য নির্ধারণ করুন

নিজের জন্য একটা টার্গেট ঠিক করে নিন। আগামী এক বছরে কুরআনকেন্দ্রিক আপনার লক্ষ্য কী? আপনি কি পুরো কুরআন খতম করতে চান নাকি নির্দিষ্ট কোন সূরার উপর মনোযোগ দিতে চান? আপনি সফলভাবে মুখস্থ করতে চান এমন কোনও অংশ আছে? যেটাই হোক না কেন, বাস্তবধর্মী আর নির্দিষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য নির্ধারণ করলে সেটা অর্জন করতেও মনোযোগী থাকতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

[১] সূরা ত্বোহা, আয়াত-ক্রম ০১

(১) সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম ৮৯

এটা এমন কোন কাজ না যেটায় অন্যের অনুসরণ করা লাগবে। আপনার ডায়রি, ফোন অথবা দেয়ালে কাগজ সেঁটে লিখে ফেলুন আপনার টার্গেট, যাতে সারাক্ষণ তা আপনার চোখের সামনেই থাকে। এতে করে আপনার মাথায় সবসময়ের জন্য গেঁথে যাবে আপনার লক্ষ্যটা কী ছিল। ধরাছোঁয়ার সীমানার মধ্যেই আপনার টার্গেটকে ঠিক করুন যাতে বাস্তব একটা অগ্রগতি দেখতে পান আপনি। বিরাট কোন লক্ষ্য নিয়ে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে না। আপনার লক্ষ্যটা ছোট হোক, কিন্তু হোক সেটা ধারাবাহিক, নিরন্তর।

রাসূলুল্লাহ বললেন, "তোমাদের মধ্যে কি কেউ রাতের বেলা কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারবে? সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন: কিভাবে এক রাতের মধ্যে কুরআনের

এক তৃতীয়াংশ পাঠ করা সম্ভব? রাসূলুল্লাহ জবাব দিলেন: 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' হল কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।"।।

কুরআন এতোটাই বারাকাহয় ভরপুর যে শুধুমাত্র সূরা আল ইখলাস পাঠ করলেই কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য সওয়াব মিলে যায়। তাহলে কিসে আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কিতাবের সাথে সামান্য কয়েকটা মিনিট কাটাতে?

৩। কুরআনের জন্য একটা সময় ঠিক করে নিন

আমরা আমাদের ইচ্ছেমত অনেক লক্ষ্যই ঠিক করতে পারি। কিন্তু যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়া অথবা গন্তব্যে পৌঁছানোর পরিকল্পনা ছাড়া এই লক্ষ্যগুলো পূরণ করা খুব কঠিন। আপনার কুরআন পড়া এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, যেগুলোর উপর আপনি ফোকাস করছেন সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এগুলোর উপর কাজ করুন।

একটা সময় কি নির্দিষ্ট করতে পারবেন আপনি? হতে পারে সেটা আপনার যাতায়াতের সময় অথবা সকালে আপনার জেগে উঠার পর? অথবা ঘুমুতে যাবার আগে?

সময় বের করতে পারলে তো খুবই ভালো। কিন্তু যদি সেটা না পারেন, তাহলেও অস্থির হবেন না। হাতে যতটুকু সময়ই থাকুক, সেটুকুই যথাসম্ভব ব্যবহার করুন। কিছু দিন হয়তো অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি ব্যস্ততায় কাটতে পারে। ফলে মনে মনে কুরআনের যে অংশটুকু পড়বেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন, সেটুকু আপনার পড়া হয়ে উঠলো না। নিজের কাছেই এটার জন্য দায়বদ্ধ হয়ে থাকুন এবং পরের দিনের জন্য যা যা পরিকল্পনা করে রেখেছেন, সেগুলোর আগেই এই মিস হয়ে যাওয়া কাজটা করে ফেলছেন, সেটা নিশ্চিত করুন।

রামাদানে যে লক্ষ্যগুলো আপনি হাসিল করতে চাইছেন সেগুলোর পথে স্থির থাকার জন্যে আপনার নিয়মিত একটা অভ্যাসের খুব দরকার। এটা নিশ্চিত করাটা অত্যন্ত জরুরি একটা কাজ। আরো ভালো হয়, বন্ধুরা মিলে একটা রামাদান পরবর্তী কুরআন গ্রুপ বানিয়ে ফেলুন। এটা আপনাকে অনুপ্রাণিত থাকতে সাহায্য করবে এবং এমনকি যখন আপনার মনে হবে আপনার উৎসাহের জোয়ারে ভাটা পড়ছে ঠিক সেই সময়টাতেও এই উদ্যোগের ফলে আপনি নিজেকে কুরআনের সাথে যুক্ত রাখতে পারবেন।

মনে রাখবেন, কুরআনের সাথে যেটুকু সময়ই আপনি কাটান না কেন, সেটা আপনার জন্য সাহায্য হিসেবে এমনভাবে ফিরে আসবে যে আপনি সেটা কল্পনাও করতে পারবেন না।

"সাওম আর কুরআন কিয়ামতের দিন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করবে। সাওম বলবে: হে আল্লাহ, দিনের বেলা আমি তাকে খাবার আর তার আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত রেখেছি; তার জন্য আমাকে সুপারিশ করতে দিন। আর কুরআন বলবে: আমি তাকে রাতের বেলা জাগিয়ে রেখেছি; আমাকেও তার জন্য সুপারিশ করতে দিন। তাদের দুইজনকেই সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে।"স

৪। শয়তানাক আপনার উপর বিজয়ী হতে দেবেন না

কেন আমরা নিয়মিত তিলাওয়াত করতে পারি না এবং কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারি না সেজন্য আমরা অজুহাত দিয়ে দিয়ে দেরি করে ফেলি।

☆ আপনার "সময়ের অভাব" থাকতে পারে কিন্তু তার মানে এই না যে ব্যস্ততার ভিড়ে যেটুকু সময় পাবেন তা অকাজে ব্যয় করবেন, নেট সার্ফিং করবেন। অলস কাজকারবার ঝেড়ে ফেলুন নয়তো ঘুম থেকে ১৫ মিনিট আগে উঠুন।

☆ আপনার হয়তো এটা ভেবে খারাপ লাগছে যে যাইই পড়েন না কেন, তার কিছুই "আপনি বুঝতে পারেন না", আপনি কুরআনের একজন শিক্ষককে খুঁজে বের করুন, তার কাছে কুরআনের অর্থ আর তাফসীর পড়তে শুরু করুন অথবা পারলে আরবি শিখুন।

☆ আপনি হয়তো ভাবছেন "সপ্তাহে ছুটির দিনে পড়তে বসবেন"-নিজেকে জীবনের বাস্তবতাটা বোঝার চেষ্টা করুন। আগামীকাল তো নাও পেতে পারেন। অতএব যা করার সেটা আজই!

☆ দুঃখজনকভাবে এটা হতে পারে "আমি জানি না কেন আমার এই অভ্যাসটা হয় না" এরকম কোন একটা সমস্যা। যদি অভ্যাস করতে চান তো সেজন্য কষ্ট করতে হবে। পাহাড়ে চড়া খুব একটা সহজ কাজ নয়, কিন্তু উঠতে যেয়ে যদি মাঝপথেই থেমে যান তাহলে আর কোনদিন পাহাড়ের চূড়ায় আপনার পৌঁছানো হবে না। থেমে যাওয়ার চেয়ে আস্তে আস্তে এগোনোটাই উত্তম।

মনে রাখবেন, যখনই আপনি আল্লাহর দিকে একধাপ এগিয়ে যাবেন তখনই শয়তান আপনাকে বাধা দিতে আসবে। এখন রামাদানের পরে তো সে মুক্ত। সে এখন চাইবে আপনার সাথে হাজারো ধরনের মানসিক খেলা খেলতে, যাতে করে আপনাকে আরো বেশি ভালো একজন মুসলিম হতে বাধা দেওয়া যায়। কুরআনের সাথে সময় কাটাতে দেরি করিয়ে দেবার জন্য লাখখানেক অজুহাত নিয়ে সে আপনার কাছে আসবে। কিন্তু

আপনি ধরা দেবেন না। বরং যখনই সে কোন অজুহাত নিয়ে আসবে তখনই উল্টো তাকেই ধরে ফেলুন।

তথ্যে ভরা এই দুনিয়ায়, আলতু ফালতু তথ্যের উপরই ফোকাস করা সবচেয়ে বেশি সোজা। আমাদের মগজটা যেহেতু অলস পড়ে থাকে, তাই আমরা সেসব তথ্যেই মন দিয়ে বসে থাকি। কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমরা যা করি সেটাই আমরা পাই। যদি আপনি দৈনন্দিন জীবনে কুরআনকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে থাকেন, তাহলে কিভাবে আপনি কুরআন থেকে বারাকাহ হাসিল করবেন? প্রথম প্রথম, এটাকে একটা সংগ্রাম বলেই মনে হবে। এরচেয়ে বরং মোবাইলে কুরআনের অ্যাপ পাল্টে একটা গেইম নিয়ে এসে সেটা খেলাই আপনার কাছে সোজা মনে হবে। অথচ অস্বস্তির ওই মুহূর্তগুলোতেই আপনি আগের চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করে গড়ে তুলতে পারেন ভালো একটা অভ্যাস।

মূল্যবান কোন কিছুই আরামে আবামে হাসিল হয় না। তাই বিশেষ করে প্রথমদিকে কুরআনের পিছনে সময় দিন এবং দৃঢ় থাকুন। প্রথমদিকের এই কাঠিন্যের পর দেখবেন কুরআন আপনার জন্য এমন একজন হয়ে দাঁড়িয়েছে যাকে ছাড়া আপনি আর চলতেই পারছেন না।

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ৬৬২৬

[১] মুসলিম, হাদিস-ক্রম ৮১১।

৯। আপনার সালাতকে সুন্দর করে তুলুন

নবীজি বলেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক কেননা, তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুত গতিতে চলে যায়।"   (২

জীবনে যেকোন কিছুর ক্ষেত্রেই, যখন আপনি সেই জিনিসের চর্চা কমিয়ে দেবেন, তখনই আপনি তাতে দুর্বল হয়ে পড়বেন। একই কথা কুরআনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিয়মিত চর্চার জন্য সময় বের না করলে যা শিখেছিলেন তা ভুলে যাবেন। যখন আমরা গোসল করি, তখন এর মানে এই না যে আমরা এবপরে আর কখনো গোসল করবো না। যখন আমরা খেতে বসি, সেটার অর্থ এই হয় না যে আমরা এই একবারই ক্ষুধার্ত হয়েছি, আর কখনোই আমার ক্ষুধা লাগবে না।

কুরআনের সাথে লেগে থাকার খুব ভালো একটা পদ্ধতি হল সালাতে তিলাওয়াত করা। মাঝে মাঝে সালাতকে একটা বারবার করতে থাকা আচারের মত মনে হতে থাকবে যদি আমরা সবসময়ই কুরআনের শেষের দিক থেকে সেই ছোট ছোট সূরাগুলোই পড়ে যেতে থাকি। তাই যখনই কুরআন পড়বেন, একটা নিয়ত করে নিন যে যা পড়লাম তা সালাতের মধ্যেও পড়বো। কুরআনের সাথে জুড়ে থাকার জন্য এটা একটা সহজ কিন্তু কার্যকর পদ্ধতি। আর এভাবে আপনার সালাতও হয়ে উঠবে আগের চেয়ে আরো বেশি সুন্দর, আরো বেশি অর্থপূর্ণ।

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম: ২৫৮১৩

[২] তিরমিযি, হাদিস ক্রম। ২৯৪২

১০। দুআ করুন

শেষ যে পয়েন্টটা আমরা উল্লেখ করতে চাচ্ছি সেটা শেষে উল্লেখ করলেও গুরুত্বের দিকে দিয়ে শেষে পড়ে থাকবার মত নয়। এটা হল সবসময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়া, সবসময় তাঁর কাছে দুআ করা, যাতে তিনি আপনাকে তাঁর শব্দগুলো বুঝার তাওফিক দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি আমাদেরকে তাওফিক দান না করেন, তবে কোন কিছুই অর্জন করার সৌভাগ্য আমাদের কখনোই হবে না। সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপারটা হচ্ছে সবাই আমাদের ব্যাপারে যেটাকে অর্জনের অযোগ্য মনে করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটাই অর্জনের জন্য আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন।

কখনো অন্যের কথা বা কাজকে নিজের উপর প্রভাব খাটাতে দেবেন না। আপনার লক্ষ্য যদি হয় কুরআনের সাথে সম্পর্কিত এবং আল্লাহর কিতাবকে অনুধাবন করা, তাহলে বিশ্বাস আর ভরসা রাখুন আল্লাহর উপরই। এই ভরসা রাখুন যে আল্লাহ এটাকে সম্ভব করে দেবেন। আপনার পথে যত বাধার পাহাড়ই আসুক না কেন, কখনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভুলে যাবেন না। আল্লাহ জানেন আপনি এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবেন।

কুরআনের সাথে চলার পথে সামনে যত বড় শিলাপ্রস্তরই আসুক না কেন, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিন। আর এটা আপনি করতে পারবেন শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে আর তাঁর কাছে একনিষ্ঠ দুআর মাধ্যমে, যাতে তিনি কুরআনকে বানিয়ে দেন আপনার জীবনের আর আপনার অন্তরের এক চির উজ্জ্বল বাতিঘর।

১১। কমলালেবুর মত হোন

একজন মুমিন যে কিনা কুরআন তিলাওয়াত করে তার উপমা হল একটি কমলা, যার রয়েছে মিষ্টি সুঘ্রাণ আর যার স্বাদটাও মিষ্টি। আর একজন মুমিন যে কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার উপমা হচ্ছে একটি খেজুর যার কোন সুঘ্রাণ নেই কিন্তু মিষ্টতা আছে।

কুরআন হচ্ছে সেইসব বিরল কয়েকটি জিনিসের মধ্যে একটি যা কখনোই আপনার সময় কমিয়ে দেয় না। আপনার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে সহজতা আর তৃপ্তি নিয়ে আসতে কুরআনের মধ্যে রয়েছে এক অসাধারণ ক্ষমতা, যদি আপনি তাকে আপনার জীবনে স্বাগত জানান।

তাই আসুন, আজ থেকেই লক্ষ্য নেই কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক গড়ে তোলার এবং এই সম্পর্ককে আরো মজবুত করে গড়ে তোলার। রামাদানের পরেও কুরআনের সাথে আমাদের বন্ধন যেন থাকে সুদৃঢ় ও অটুট।

[১] বুখারি, হাদিস-ক্রম: ৫৪২৭, মুসলিম, হাদিস-ক্রম: ৭৯৭

বিদায় রামাদান

রামাদান মাস। দিনগুলো আপনি হয়তো সাওয়াব দিয়ে পূর্ণ করেছেন কিংবা গুনাহ দিয়ে। অভিনন্দন তাদের জন্য, যারা এক শুভ্র পরিচ্ছন্ন আমলনামা হাতে নিয়ে বামাদান পার করেছে। যখন তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে দাঁড়াবে, এই আমলনামা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। তাদেরকে অভিনন্দন, যারা আল্লাহর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় এই রামাদানে অশ্রুবর্ষণ করেছে, আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের যে বিশেষ সম্পর্ক সে সম্পর্ককে উপভোগ করতে পেরেছে। তারাই সৌভাগ্যবান, যারা নিজেদের ভালো আমল দিয়ে নিজেদের পবিত্র করতে পেরেছে, উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে। কেননা এই নৈকট্য লাভের মাধ্যমেই একজন মানুষ সত্যিকারের সম্মান লাভ করে, নিজের আত্মাকে বিশুদ্ধ করে তুলতে পারে।

সে কতই না সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যে রামাদানকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর সাথে নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছে। নতুন অঙ্গীকার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, পরিশুদ্ধ মন ও সতেজ সংকল্প নিয়ে সে রামাদানের পরবর্তী দিনগুলো শুরু করতে যাচ্ছে। অন্য জাতিগুলো নতুন বছর এলে, প্রতিবার বছরের শুরুর দিনে অর্থহীন সব অঙ্গীকার করে-যেগুলো তাদের কখনও পূরণ করা হয়ে উঠে না। কিন্তু রামাদানে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক এই শুদ্ধতার ধারাবাহিকতা-গুনাহ থেকে নিজেদের বিরত রাখার দৃঢ় সংকল্প। যদি না-ও পারি, অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসার সুযোগ আছে-মহান রবের তাওবার দরজা আমাদের জন্য সবসময় খোলা।

রামাদান চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের অঙ্গীকার হোক আমাদের কিয়াম এবং সিয়াম যেন ছুটে না যায়। বছরের বাকি দিনগুলোতেও যেন এই ইবাদাতগুলো আমাদের জীবনের অংশ হয়ে থাকে। প্রতিটি রামাদান এবং জীবনের বাকী সময়টুকুও যেন এভাবে কাটাতে পারি।

রামাদানে আমরা অর্জন করেছি তাকওয়া। তাকওয়া হলো মনের এক ধরনের সচেতন অবস্থা-যে সচেতনতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় আল্লাহ আমাদের সবসময় দেখছেন। এই তাকওয়া যেন বছরের বাকি সময়জুড়েও আমাদের মধ্যে থাকে। রামাদান চলে যাচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি আমাদের আনুগত্য, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর কাছে দুআ, অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর কাছে চাওয়া-এই অভ্যাসগুলো যেন আমাদের ছেড়ে চলে না যায়। এই রামাদানে আপনি আপনার অভ্যাস বদলেছেন, গুনাহ ছেড়ে দিয়েছেন, অতীত জীবনের গুনাহগুলোর জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন, আল্লাহ আপনাকে গুনাহের গভীর অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছেন। ইনশাআল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি আজ একজন পরিচ্ছন্ন এবং পরিশুদ্ধ মানুষ। এতটাই পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ, যেন মাত্র আপনার জন্ম হয়েছে। কাজেই গুনাহের সেই আস্তাকুঁড়ে নিজেকে আর কখনোই ছুঁড়ে ফেলবেন না।

রামাদানের শেষ দিনগুলোতে আপনার সর্বোচ্চটা ঢেলে দিন। বিশ্রাম নেওয়াব সময় আমাদের হাতে নেই। মনে রাখবেন, একজন মুমিন হিসেবে আমরা তখনই বিশ্রাম লাভের সুযোগ পাব, যখন আমাদের দুই পা জান্নাতে প্রবেশ করবে। হতে পারে বামাদানের শুরুতে আপনার মাঝে কিছুটা ঘাটতি ছিল। সেটা এখন ভুলে যান। আপনি বামাদান কীভাবে শেষ করছেন, সেটার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। তাই আসুন, রামাদানকে বিদায় জানাই নিজের সবচেয়ে ভালোটা দিয়ে। রামাদানের পর কী আসবে, সেটার জন্য এখনই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করুন। রামাদান শুরুর আগে রামাদানের জন্য আমরা যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি, এবং শেষ মুহুর্তে নিজেদের সবচেয়ে ভালোটা ঢেলে দিচ্ছি-তেমনি বামাদানের পর আমরা কীভাবে কী করব সেটার জন্যও নিজেদের তৈরী করে রাখব ইনশাআল্লাহ। রামাদান পরবর্তী সময়টা যেন হঠাৎ করে আমাদের সামনে হাজির না হয়, সেটার জন্যও যেন আমরা প্রস্তুত থাকি।

রামাদানের পর কী হবে? রামাদানের সময়টায় শয়তানকে আটকে রাখা হয়েছিল। সে নিদারুণ মনঃকষ্ট নিয়ে দেখছিল আমরা সালাত আদায় করছি, ইবাদাত করছি। সে

দেখেছে আমরা ঈমানের পরিষ্কার চাদর দিয়ে নিজেদের ঢেকেছি। তাই সে চাইবে রামাদান শেষ হলে গুনাহের নর্দমায় যেন আমাদের আবার টেনে হিঁচড়ে নামাতে পারে। রামাদানের দিনগুলোতে সে তিক্ততা আর যন্ত্রণা নিয়ে আমাদের ভালো আমল আর তাওবার দিকে কেবল তাকিয়ে ছিল, কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। রামাদান শেষ হয়ে গেলে সতর্ক থাকবেন, আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার আপনি করেছেন, শয়তান যেন সেই অঙ্গীকার ভেঙে আপনাকে প্ররোচিত করতে না পারে। আল্লাহর সাথে আপনার শপথ এবং প্রতিশ্রুতিকে নষ্ট করবেন না। রামাদান মাসে যে ভালো আমলগুলো আপনি করেছেন, সেগুলো যেন একটি অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদের মতো। ইটের পর ইট সাজিয়ে, স্তবে স্তবে আপনি এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। রামাদানের প্রতিটি সেকেন্ডকে কাজে লাগিয়ে এই প্রাসাদ নির্মাণে আপনি ত্যাগ আর কষ্ট স্বীকার করেছেন-ক্ষুধার কষ্ট, তৃষ্ণার কষ্ট, নির্ঘুম রাত এবং নিজের প্রবৃত্তি আর নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করার কষ্ট। শুধু রামাদানে আপনি যে ভালো কাজগুলো করেছেন, সেটার দাম একজন কোটিপতির সম্পদের চাইতেও বেশি!

এবার একটা ঘটনা কল্পনা করুন। ধরুন, আপনি একটা বিশেষ প্রজেক্টে বেশ কিছু সপ্তাহ বা মাস জুড়ে অনেক খাটুনি করলেন। আপনি আপনার সমস্ত কাজ একটি পাওয়ারপয়েন্ট ফাইলে সেইভ করে রাখলেন। কিন্তু আপনার প্রফেসরকে দেখানোর ঠিক আগ মুহূর্তে আপনি হঠাৎ করে পুরো হার্ড ড্রাইভ ফরম্যাট করে দিলেন। মানুষ বলবে আপনি স্রেফ একটা পাগল। কারো যদি কোটি টাকা থাকে যা সে জীবনভর কষ্ট করে কামিয়েছে, সেটা যদি সে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে তাহলে কি আমরা তাকে পাগল বলব না? সারা রামাদান ইবাদাত করে রামাদান শেষে যারা আবার গুনাহের পথে ফিরে গেল- তাদের উদাহরণও এমনই।

"আর তোমরা সে নারীর মতো হয়ো না, যে তার পাকানো সুতো শক্ত করে পাকানোর পর টুকরো টুকরো করে ফেলে। তোমরা তোমাদের উপর অঙ্গীকারকে নিজেদের মধ্যে

প্রতারণা হিসেবে গ্রহণ করছো (এই উদ্দেশ্যে) যে, একদল অপর দলের চেয়ে বড় হবে।" (সূরাহ আন-নাহল ১৬:৯২)

জুবায়েজ, আস সুদ্দি এবং ইবনু কাসিরের মতে, এখানে মক্কার এক পাগল মহিলার কথা বলা হচ্ছে। কারো কারো মতে তার নাম রাইতাহ বিনতে আমর ইবনু কাব, কারো মতে এই আয়াতে কেবল প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা ভঙ্গের ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে। ঘটনাটা হলো-মক্কার সেই মহিলা অনেক সুন্দর সুন্দর কম্বল, কাপড়, টুপি তৈরি করত, কিন্তু বানানো শেষ করে সে দুই দিক থেকে সুতা ধরে টান দিয়ে সুন্দর জিনিসটা নষ্ট করে ফেলত। সবাই বলত সে একটা পাগল। এটি হচ্ছে সেই লোকটির মতো, যার প্রজেক্টের উপর তার পুরো ক্যারিয়ার নির্ভর করে আছে, কিন্তু এটা জমা দেওয়ার আগেই সে তার হার্ড ড্রাইভ ফরম্যাট করে দিল। আর যে লোকটা রামাদানের পর আগের জীবনে ফিরে গিয়ে তার সমস্ত ভালো আমল নষ্ট করে ফেলল, সে এদের চাইতেও বড় পাগল।

কাজেই সেই মহিলার মতো হবেন না, যে নিজের বোনা সুতা খুলে ফেলে সুন্দর জিনিসটিকে নষ্ট করে ফেলে। সেই লোকটার মতো হবেন না, যে বছরের পর বছর পরিশ্রম করে অনেক উঁচু একটা দালান নির্মাণ করল আর কাজটা শেষ হওয়ার পর যখন তার সেই দালানে প্রবেশ করার সময় এলো, তখন সে একটি ডিনামাইট দিয়ে দালানটিকে ধ্বংস করে ফেলল। আপনি রামাদানের সিজনাল মুসলিম হবেন না, আপনি হবেন একজন ঈমানদার মুসলিম, ইহসানি মুসলিম, রাব্বানি মুসলিম। রামাদান শেষ হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে দিনগুলো। কিন্তু যিনি এই রামাদানের মালিক, যিনি দিন-রাত সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কোনো শেষ নেই-তিনি চিরঞ্জীব!

রামাদানের পর সেই আগের জীবনে ফিরে যাওয়ার বিষয়টা আসলে কেমন? আচ্ছা ভেবে দেখুন, এমন একটা লোক যার গা থেকে অসম্ভব দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, তার আলুথালু

বেশভূষা, অপরিচ্ছন্ন এবং নোংরা শরীর। আমরা সাধারণত এরকম কারো কাছে ঘেঁষতেও চাই না। কল্পনা করুন, সেই লোকটি একদিন ভালোমতো নিজেকে পরিষ্কার করে গোসল করল, নিজের চুল পরিপাটি করে আঁচড়াল এবং নিজের গায়ে সুগন্ধি মাখল। কতই না সুন্দর সেই দৃশ্য! কিন্তু সেই একই লোকটি যদি আবার নোংরার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে আগের মতো হয়ে যায়, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে?

এই উদাহরণ হলো সেই লোকটির মতো, যাকে আল্লাহ রামাদানে তার সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র করে দিলেন, কিন্তু লোকটি রামাদানের পর আবার তার সেই পাপের রাজ্যে ফিরে নিজেকে নোংরা করল।

আপনি কি এমন কাউকে দেখেছেন, যারা সিগারেট খেয়ে নিজের শরীরের বারোটা বাজিয়েছে? রোগে ভুগে ফ্যাকাসে, দুর্বল আর হলুদ হয়ে গেছে? তার মৃত্যু প্রায় সমাগত। এমন অবস্থায় লোকটি হাসপাতালে গেল। ডাক্তার তার চিকিৎসা করল, তাকে ওষুধ দিল, লোকটি আবার সুস্থ সবল হয়ে উঠল। এরপর যদি লোকটি হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে আবার সিগারেট খাওয়া শুরু করে, তাহলে বিষয়টা কেমন হবে?

বামাদান ঈমানের জন্য একটা থেরাপির মতো। এই থেরাপির কল্যাণে আপনি একজন সুস্থ মানুষ। খেয়াল রাখবেন পাপের অসুস্থতা যেন আপনার সুস্থ-সবল আত্মাকে কলুষিত করতে না পাবে, আপনাকে যেন আবার দুর্বল করতে না পারে। শয়তানকে কখনোই তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করার সুযোগ দেবেন না।

"যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব।" (সূরাহ আল ইসরা

১৭:৬২)

শয়তান বলছে আমি তাদেরকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসব এবং তাদের পথভ্রষ্ট করব। এখানে যে শব্দটি এসেছে, সেটি হলো আহতানিকান। একটা কুকুরকে যেভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, শয়তান সেভাবে আমাদেরকে জাহান্নামে দিকে টেনে নিতে চায়- আহতানিকান শব্দের এটাই বাস্তব রূপ। আল্লাহ বলছেন,

"আর তাদের উপর ইবলিস তার অনুমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মুমিনদের একটি দল বাদে সকলেই তার পথ অনুসরণ করল।" (সূরাহ সাবা ৩৪:২০)

শয়তান তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পেরেছে সবার ওপরে, শুধু মুমিনদের দল ছাড়া। কাজেই আপনিও সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করুন, যাদের উপর শয়তান বিজয়ী হতে পারবে না। আজ থেকেই পরিকল্পনা শুরু করুন ঈদের পর কী করবেন। না হলে শয়তান আপনাকে ধোঁকায় ফেলবে।

রামাদানের পর প্রতিদিন কিছু কুরআনের আয়াত পড়ুন। আজই দৃঢ় নিয়ত করুন-যে করেই হোক রোজ এতটুকু কুরআন পড়ব-কখনোই ছাড়ব না। রাতের কিছু সময় আল্লাহর সাথে একান্তে কাটান। সেটা যত সামান্যই হোক না কেন, কখনোই সেটা ছাড়বেন না। প্রতি মাসের কয়েকটা দিন সিয়াম পালন করুন, হতে পারে সেটা দুই

কিংবা তিন দিন। অল্প দিয়েই শুরু করুন, ধীরে ধীরে আপনি উন্নতি করবেন, কিন্তু মিস যেন না যায়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন যে, সময় যেমনই হোক- আপনি কাজগুলো করবেন।

রামাদানের শেষ দিনগুলোতে আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আপনার কাজগুলো কবুল করে নেন।

"এবং যারা যা দান করবার, তারা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে (তারা ভয় পায় যে তাদের দান কবুল হল কিনা) এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে।" (সূরাহ আল মুমিনূন ২৩:৬০)

এই আয়াত নাযিল হবার পর আইশা (৬) আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, এই আয়াতে কি সেই লোকদের কথা বলা হচ্ছে যারা মদ খায়, চুরি করে?" রাসূল (৬) উত্তর দিলেন, "না, এখানে বলা হচ্ছে সেসব বান্দার কথা যারা সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং দান করে, আর ভয় করে তাদের এই ইবাদাতগুলো আল্লাহ আদৌ কবুল করেন কি না।"

কিছু সালাফদের কথা আমরা জানি, যারা রামাদান শেষ হওয়ার পর ছয় মাস পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দুআ করতেন তাঁদের রামাদানের ইবাদাত যেন কবুল করা হয়। কারণ আপনি ইবাদাত করেছেন তার মানে এই না যে সেই ইবাদাত কবুল হয়ে গেছে।

ইবরাহিম।) কাবা ঘরের খুঁটি নির্মাণ করেছিলেন আল্লাহর নির্দেশে। তিনি ছিলেন আল্লাহর এক বিশেষ নবি, সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী অনেক বড় একটা কাজ করছেন। তাঁর আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। তারপরেও তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন যেন তাঁর এই আমল আল্লাহ কবুল করে নেন,

"হে আল্লাহ, তুমি আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চই তুমি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।" (সূরাহ বাক্বারা ২:১২৭)

কখনই এটা ভেবে অহংকার করবেন না যে, আপনি আল্লাহর ইবাদাত করেছেন, অনেক বড় কিছু করে ফেলেছেন। ধরুন আপনার খুব টাকার দরকার এবং একজনের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিলেন এবং আপনি সেটা একসময় ফেরত দিতে গেলেন। কিন্তু ফেরত দিতে গিয়ে আপনি দেরি করে ফেলেছেন, আর পুরো টাকাও ফেরত দিতে পারেননি। আপনি কি তাকে ঔদ্ধত্যের সাথে টাকাটা ফেরত দেবেন? তাকে বলবেন, "এই নাও তোমার টাকা, তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না!" নাকি তাকে আপনি টাকাটা বিনয়ের সাথে ফেরত দেবেন এবং চাইবেন সে আপনার সাথে যাগ না করুক, কারণ সে আপনার উপকার করেছে।

আল্লাহর নিয়ামত গুণে শেষ করা যায় না। এর কোনো প্রতিদান নেই। তাই আপনি আল্লাহর ইবাদাত করছেন এই ভেবে কখনও অহংকার করবেন না।

আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আল্লাহ আপনার আমলগুলো কবুল করেন এবং নম্র ও বিনয়ী থাকুন। আল্লাহ আপনাকে অনেক দিয়েছেন এবং আপনি যত যা-ই করুন না কেন, কখনোই তার প্রতিদান দিতে পারবেন না।

"আর যদি তুমি আল্লাহ তাআলার নিয়ামত গুনতে চাও, তুমি তা কখনোই গুনে শেষ করতে পারবে না।" (সূরাহ নাহল ১৬:১৮)

রামাদান শেষে আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ রামাদানের সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হবে। অতএব আমল করতে থাকুন, আর আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন যেন আপনি এই রামাদানের উসিলায় জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্তদের একজন হয়ে যান।

সুতরাং আমাদের করণীয় হলো,

প্রথমত, আমরা রামাদানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব। রামাদানের শেষ মুহূর্ত বলতে বোঝায় রামাদানের শেষ মাগরিব পর্যন্ত। আমাদের দিন শুরু এবং শেষ হয় মাগরিব দিয়ে। যদি আগামীকাল রামাদানের শেষ দিন হয়, সেক্ষেত্রে আগামীকাল শেষ হবে মাগরিব দিয়ে আর সেটিই হবে রামাদানের শেষ মুহূর্ত। আপনাকে সেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্তই চেষ্টা করে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আপনি দুআ করতে থাকুন যেন আল্লাহ আপনাকে কবুল করে নেন।

তৃতীয়ত, রামাদানের পরেও এই পরিবর্তন ধরে রাখার চেষ্টা করুন।

এবং চতুর্থত, নিজেদের অন্তরকে পরিষ্কার এবং পবিত্র করতে সচেষ্ট হওয়া।

রামাদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো একটা পবিত্র অন্তর নিয়ে একে বিদায় জানানো। ইবাদাতের ক্ষেত্রে অন্তর পবিত্র রাখার পাশাপাশি অন্য ভাইবোনদের প্রতিও আমাদের অন্তর পবিত্র রাখতে হবে। আবু হুরায়রা (৩) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার মানুষের আমলসমূহ আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করা হয়। যারা আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করে না তিনি তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করে দেন, তবে শুধুমাত্র তাদেরকে ছাড়া যারা একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেয়। তাদের ত্যাগ করো, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয়।"

যাদের সাথে আপনি সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তাদের সাথে মীমাংসা করে নিন এবং সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন। আপনি যদি চান রামাদানের আমলগুলো আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যাক, তাহলে এক্ষুনি আপোস করে নিন-মিটিয়ে ফেলুন যত তিক্ত সম্পর্ক। এই কাজটা করুন আজ এবং এক্ষুনি- রামাদান শেষ হয়ে যাবার আগেই!

কেউ হয়তো বলবেন, "আমার এখানে কোনো দোষ ছিল না, সব দোষ তার। সে-ই এসব শুরু করেছিল, সে-ই দোষী" ইত্যাদি ইত্যাদি। না ভাই, এখানে কে দোষী সেটা ব্যাপার নয়। আপনি যদি চান আপনার আমলগুলো কবুল হোক, তাহলে আপনাকে সব মনমালিন্য দূর করতেই হবে এবং আপনজনদের সাথে মিলে যেতে হবে। কোনো ভাই হয়তো বলবেন ঐ ভাইয়ের সাথে আমার মনের মিল হয় না, বোনেরা হয়তো বলবেন ঐ বোনের সাথে ঠিক মিশতে পাবি না ইত্যাদি। দেখুন, মীমাংসা করার অর্থ এটা না যে, তাকে কালকেই বাসায় দাওয়াত দিতে হবে বা একসাথে বসে কফি খেতে হবে। সেরকম কিছু করতে পারলে তো অবশ্যই খুব ভালো। কিন্তু সেটা যদি সম্ভব ন। হয়, নুন্যতম আপনার যেটা করা উচিত সেটা হলো-আসসালামু আলাইকুম বলে অন্তত তাকে সালাম দিন। ভাইয়েরা ভাইদেরকে এবং বোনেরা বোনদেরকে সালাম দিন। অন্তত এটুকু আপনাকে করতেই হবে যদি আপনি সেই মানুষদের একজন না হতে চান- যাদের ব্যাপারে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন তাদেরকে যেন পরিত্যাগ করা হয়। এই কাজটি করুন ঈদের আগেই। সাক্ষাৎ করুন, এসএমএস পাঠান অথবা মসজিদে আসুন এবং সালাম দিয়ে আপনার ভাই বোনদের আপন করে নিন। আপনি নিজে প্রথমে উদ্যোগী হোন, কেননা যিনি প্রথম এগিয়ে আসবেন তিনিই আল্লাহর বেশি প্রিয় হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

আরেকটি দিক হলো, রামাদানে আমরা মুসলিম ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দেখা সাক্ষাৎ করি। ইফতাবে, তারাবীতে, মসজিদে আমাদের প্রতিনিয়ত দেখা হচ্ছে, বিভিন্ন দাওয়াতে অনেকেই পরিবার নিয়ে একসাথে ইফতার

করে। এই অধিক দেখা সাক্ষাতের ফলে পরস্পরের সাথে নানা সমস্যা বা মনমালিন্য তৈরি হবাবও একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। এই ধরনের মনমালিন্য বা পারস্পরিক ঘৃণা ছড়ানোর কাজ খোদ মসজিদে বসেই হয়। মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন ঘরানা আছে, বিভিন্ন মতের লোক আছে। এদের মধ্যকার যে ঘৃণা আর অসহনশীলতা আমরা দেখি, সেগুলো প্রায়ই মসজিদে বসেই চর্চা করা হয়। পবিত্র রামাদান মাসেও সেগুলো বন্ধ হয় না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, রামাদানের শেষ মুহূর্তে অন্তর থেকে সকল রাগ, ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ মুছে ফেলুন এবং অন্তরটাকে পবিত্র করে ফেলুন। এই উম্মাহর মাঝে পবিত্র হৃদয়ের আজ বড় অভাব। আজ সেই উম্মাহ কোথায়, যারা সালাফদের মতো প্রতি রাতে তার সব ভাইদের ক্ষমা করে দিয়ে, সকলের প্রতি সব ক্ষোভ ঘৃণা মুছে ফেলে একটা পবিত্র অন্তর নিয়ে ঘুমুতে যান? কে ঠিক কে ভুল সেটা কোনো বিষয় নয়, জরুরি হলো নিজের অন্তরকে পরিষ্কার রাখা, কারো প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব না বাখা।

"আর তাদের পর যারা এসেছে তারা বলল-হে আমাদের রব। আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করে দিন যারা আমাদের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর আমাদের অন্তরে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কোনও ঘৃণা রাখবেন না। হে রব! নিশ্চয়ই আপনি অতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (সূরাহ হাশর ৫৯:১০)

আল্লাহ এই আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করেছেন যারা দুআ করেছিল এই বলে যে-হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণা রাখবেন না।

ইবনু কাসির (র) তাঁব আল বিদাযাহ ওয়ান নিহায়ার ত্রয়োদশ খণ্ডে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান ইবনু হুসাইন বলেন, "আমি ইয়াস ইবনু মুয়াবিয়ার সামনে এক

ভাই সম্পর্কে কিছু খারাপ কথা বললাম। ইয়াস ছিলেন একজন জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু লোক। ইয়াস আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি রোমানদের সাথে যুদ্ধ করেছ? সুফিয়ান উত্তর দিলেন, না। ইয়াস জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সিন্ধু, হিন্দ অথবা তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ করেছ? সুফিয়ান বললেন, না, তাদের সাথে যুদ্ধ করিনি। ইয়াস তখন বললেন, ইসলামের শত্রু সিন্ধু, হিন্দ আর তুর্কিরা তোমার হাত থেকে নিরাপদ, অথচ মুসলিম ভাইয়েরা তোমার থেকে নিরাপদ নয়-এটা কীভাবে সম্ভব?"

এই ঘটনার পর সুফিয়ান বললেন, "এর পর থেকে আমি আর কখনও মুসলিমদের ব্যপাবে কথা বলিনি।"

কিছু লোক আছে যারা মুসলিমদের সাথে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, তাদেরকে অপবাদ উপহার দেয়, আর তাদের মিষ্টি হাসিটা গচ্ছিত রাখে তাওহীদের শত্রুদের জন্য। আন্তঃধর্ম গোলটেবিল বৈঠকে তাদের দেখবেন কাফির বন্ধুদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল! কারো মাঝে শির্ক থাকলে তারা সেটাকে বড় কোনো সমস্যাই মনে করে না, উল্টো তার সাথে আলোচনায় বসাটাকে তারা বিশাল জরুরি ব্যাপার মনে করে। অন্যদিকে বিশুদ্ধ তাওহিদে বিশ্বাসী কোনো মুসলিম যদি এই মতের অনুসারী হয় যে, ভোট দেওয়া হারাম, তাহলে তারা তার চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করবে! তারা তাকে একঘরে করবে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটাবে, গুজব ছড়াবে-পারলে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বে। কবর পূজাবীদের সাথে একাত্ম হতে তাদের কোনো আপত্তি নেই, খ্রিষ্টান তিত্ববাদীদের সাথে বৈঠক-সংলাপ তাদের চোখে অবশ্য কর্তব্য, আর তাদের মতে শিয়াদের সাথে ভ্রাতৃত্ব হতে হবে সবার আগে-একেবারে ফরজে আইন!

কিন্তু আপনি যদি মুসলিম উম্মাহর স্বার্থয়ংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলেন, উম্মাহের জন্য দরদী মানুষদের সাথে সম্পর্ক রাখেন, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন-তাহলে তারা আপনার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগবে। আপনি যদি দুর্বল, কারারুদ্ধ, নিহত এবং যাদের

জন্য কথা বলার কেউ নেই তাদের জন্য কথা বলেন-তাহলে আপনার আর রক্ষা নেই। আল্লাহর শত্রুদের জন্য কোমল-দরদী হওয়া এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহতে বিশ্বাসীদের সাথে তর্জন-গর্জন করা-এটা মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। যে বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ মায়িদায় বলেছেন, তারা মুসলিমদের প্রতি সদয় এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। আপনার ভাইয়ের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে, সেটা তাদের কাছ থেকে শিখুন, যাদের আচার-ব্যবহার সাত আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র করেছিলেন।

তিরমিধি এবং বায়হাকিতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটা সাকিফ গোত্রের সাথে যুদ্ধের প্রেক্ষিতে। সাকিফ গোত্র সাহাবিদের আক্রমণ করছিল। তারা সাহাবিদের দিকে তীর ছুঁড়ছিল। কিন্তু নবিজি (ড) সাকিফ গোত্রের জন্য বদ-দুআ করলেন না, বরং তাদের হিদায়াতের জন্য দুআ করলেন। বললেন, "হে আল্লাহ, তাদের পথ দেখাও, তারা যেন আমার কাছে আসে।"

দাউস নামে আরেকটা গোত্র ছিল আল্লাহর রাসূল (৯)-এর প্রতি শুত্রুতা পোষণ করত। সেই গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তুফায়েল ইবনু আমর আদ-দাউসী ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং এই সংবাদ পৌঁছানোর জন্য দাউসদের কাছে ফিরে গেলেন। তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন কিন্তু তারা তেমন কেউই তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। শুধু অল্প কিছু আত্মীয় ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাদের মাঝে একজন ছিলেন আমাদের প্রিয় সাহাবি আবু হুরায়রা (ড।।

তুফায়েল মনঃকষ্ট নিয়ে নবিজির কাছে ফিরে গেলেন, বললেন তার গোত্র তার সাথে কেমন আচরণ করেছে। নবিজি দাউস গোত্রের জন্য দুআ করতে হাত তুললেন। সেটা দেখে আবু হুরায়রা বললেন, "দাউসদের দিন বুঝি আজ শেষ।” তিনি ভাবছিলেন আল্লাহর রাসূল দাউসকে বদ-দুআ করবেন আর দাউস গোত্র ধবংস হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে বহনতের নবি (ড) দুহাত তুলে দুআ করলেন, "হে আল্লাহ!

দাউসদেরকে হিদায়াত করুন এবং তাদেরকে আমার নিকট প্রেরণ করুন।" আল্লাহ নবিজি (ज) সম্পর্কে বলেছেন,

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।" (সূরাহ আম্বিয়া ২১:১০৭)

আল্লাহর রাসূল (ও) তাঁর ঘোর শত্রুদের সাথে যে অনুগ্রহ, দয়া আর হিকমাহ দেখিয়েছিলেন-সেটা আজকে খোদ মুসলিমবা আরেক মুসলিমের সাথে দেখাতে চায় না তুচ্ছ মতপার্থক্যের কারণে।

আমরা তাইফের ঘটনা জানি। তাইফবাসী নবিজিকে রক্তাক্ত করেছিল, তাঁর উপর পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল, তাঁকে গোয়েন্দাগিরির মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। তাইফের দিন ছিল আল্লাহর রাসূলের দাওয়াহ জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন। গোটা তেইশ বছরের নবুওয়াতের জীবনে তাইফবাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে গিয়ে আল্লাহর বাসূল (খ) সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই পরিস্থিতি বদলে যায়, আল্লাহর বাসূলের হাতে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা আসলো।

তাইফের ঘাম তখনো শুকায়নি, তাইফের রক্ত তখনো মুছে যায়নি, সেই মুহূর্তে আল্লাহর রাসূলের কাছে এলেন ফেরেশতা জিবরীল (ও৪)। বললেন তিনি আল্লাহর রাসুলের সাথে আছেন, এমনকি পাহাড়ের ফেরেশতারাও তাঁর সাথে আছেন। আল্লাহর রাসূল যদি চান, তাঁরা তাইফের পর্বতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন, তাইফের লোকদের দুই পাহাড়ের মাঝে পিষে দেবেন। যদি আল্লাহর রাসূল এভাবে প্রতিশোধ নিতে চাইতেন, তা বিশ্ববাসীর জন্য উচিত শিক্ষা হয়ে যেত, আল্লাহর রাসূলের সাথে কেউ কখনো লাগতে আসত না।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কী বলেছিলেন? তিনি তাইফবাসীদের ছেড়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন,

"হয়তো তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা এমন প্রজন্মের জন্ম দেবেন যারা আল্লাহর ইবাদাত করবে।"

কী তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি! এবং আসলে তা-ই হয়েছিল। যে লোকগুলো আল্লাহ তাআলার নিকৃষ্ট শত্রু ছিল, যারা নবিজি (ﷺ) এর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল, তাদের পরের। প্রজন্মই ইসলামের নেতৃত্ব দিয়েছিল, এবং তারা ছিলো ইসলামের হিরো।

যে লোককে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এই উম্মাহর ফিরাউন বলে অভিহিত করেছেন, তার উত্তরাধিকার থেকেই জন্ম নিয়েছেন ইকরিমাহ ইবনু আবু জাহেল। এই ইকরিমাহ আবু বকর (رضي الله عنه) এর খিলাফতের সময়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন।

ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে ভীতি প্রদর্শন করে বলেন-

"তাকে আমার হাতেই ছেড়ে দাও যাকে আমি নিজেই সৃষ্টি করেছি। আর তারপর তাকে সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছি। সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। আর যার জীবনকে আমি আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের বানিয়ে দিয়েছি। এত কিছুর পরও তার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমি তাকে আরও দিই। না। নিশ্চয়ই সত্যই সে ছিল একগুঁয়ে আর আমার আয়াতসমূহের বিরোধিতাকারী। আমি তাকে নিদারূণ যন্ত্রনার সম্মুখীন করবা" (সূরাহ মুদ্দাসসির ৭৪:১১-১৭)

কুরাইশরা যখন আল্লাহর রাসূলের নামে যেমন পারছিল মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছিল, তখন এই ওয়ালিদ ইবনু মুগিরাই রাসূলুল্লাহর নামে কোন কথাটা ছড়ালে মানুষের কাছে তাঁকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় তা ঠিক করে দিত। অথচ এই ওয়ালিদ বিন মুগিরার ঘরেই জন্ম হলো আল্লাহর তরবারি খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (৬) এর। আবু লাহাব, যাকে কুরআনে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে, তার ছেলে উতবা আর মুতইব মক্কা বিজয়ের দিন মুসলিম হয়ে গেলেন, আর তাঁরাই হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামের জন্য জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করলেন।

সূতরাং এখনই সময়, মুসলিম ভাইবোনদের বিরুদ্ধে আপনার অন্তরে কোনো বিদ্বেষ থেকে থাকলে তা ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে ফেলুন। আপনার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে নিন। কলুষিত হৃদয় কখনও কখনও পনের, বিশ, এমনকি পাঁচশ বছর ধরে অন্তরে বিদ্বেষ পুষে রাখে। আপনার অন্তর কতদিন যাবৎ বিদ্বেষে ভরে আছে, তা ভুলে যান। দুদিন আগেও যদি কিছু একটা ঘটে থাকে, সেই বিদ্বেষ ঝেড়ে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে নিন।

কিছু মানুষ আছে যাবা তাদের জীবন, সম্পদ, সম্মান, পবিবার সবকিছু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেয়, আর কিছু মানুষ আছে যারা কুৎসা, হিংসা এবং বিদ্বেষের পেছনেই নিজেদের জীবনকে শেষ করে দেয়। তাকওয়া অর্জনের মাস এই রামাদানেও যদি এই রোগ থেকে আপনার মুক্তি না মেলে, তবে আপনার অন্তরে রামাদানে তাকওয়া অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

ইবনু আসাকির(৬) একদিন বলেছিলেন "তোমরা আলিমদের গোশতকে ভয় করো" অর্থাৎ তাদের নিন্দা কোরো না, তাদের ব্যাপারে বাজে কথা বলো না এবং তাদের নামে মিথ্যা বটিয়ো না। আলিমদেব গোশত খাওয়াকে ভয় করুন, কেননা আলিমদের ব্যাপারে গীবত করে আপনি যে গোশত খাচ্ছেন, তা বিষাক্ত গোশত। যারা আলিমদের মর্যাদা

নষ্ট করে, তাদের পরিণতি ভালো হয় না। শুধু আলিম নন, বরং আমি বলব যে, যারাই কোনো মুসলিমের গীবত করে, তাদের পরিণতি হয় ভয়াবহ। এমন অনেক উদাহরণ আছে, যারা তাদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পুষে রাখত-পরবর্তীতে তাবা মুরতাদ হয়ে গেছে। একেবারে খাঁটি মুরতাদ। তারা নিজেদের ইসলাম ত্যাগের কথা নিজেরাই ঘোষণা করেছে, এমনকি কিছু লোক নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করেছে! নোংরা ও কলুষিত হৃদয় আপনাকে এক সময় অনেক মারাত্মক দিকে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং অন্তরের এই রোগ পরিষ্কার করে ফেলুন। অন্তরের বিদ্বেষ ধুয়েমুছে সাফ করে নিন।

একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এক লোককে ধরে আনা হলো। লোকটা মদ খেয়েছিল। তাঁরা তাকে দোররা মারল। সেই লোক আবারও মদ খেল। আবারও তাকে ধরে এনে দোররা মারা হলো। এরকম বার বার হতেই থাকল। এক সাহাবি বিরক্ত হয়ে বলেই ফেললেন, "আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক।"

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "এভাবে বলো না। তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানকে বেশি সাহায্য কোরো না।"

সে তো আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, সে একজন মুসলিম। হ্যাঁ, মদ খেয়ে সে অবশ্যই গুনাহ করছে, এবং এই গুনাহকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। হয়তো তার এমন অসংখ্য আমল আছে, যেটা আপনার বা আমার পক্ষে করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ হয়তো তার একটা গুনাহকে প্রকাশ করে দিয়েছেন, অথচ তার অগণিত আমল আমাদের নিকট এখনো অজানা রয়ে গেছে। যারা অন্তরে অন্যের ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করে, হতে পারে তার নিজের অসংখ্য গোপন গুনাহ আছে, যেগুলো আল্লাহ আমাদের সামনে এখনো প্রকাশ করেননি। তার গুনাহর কথা কেউ জানে না বলেই সে অন্যের

গুনাহর ব্যাপারে এত কড়া হচ্ছে। নিজের ব্যাপারে অহংকার দূর করুন, নিজেকে অন্যদের তুলনায় বড় মনে করা বন্ধ করুন- তাহলে আপনার জন্য নিজেকে সংশোধন করা সহজ হয়ে যাবে।

বকর ইবনু আব্দিল্লাহ (এ) বলেন, "যদি তোমরা কোনো ব্যক্তিকে দেখো যে, সে অন্যের দোষ খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে আছে, অথচ নিজের আমলের ব্যাপারে একেবারেই গাফেল- তবে জেনে বেখো যে, আল্লাহ তার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করছেন। এটা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পরিকল্পনার একটা নিদর্শন মাত্র।"

"যেদিন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না, একমাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।" (সূরাহ আশ-শুআরা ২৬:৮৮-৮৯)

এখানে কি জিহ্বার সংযমের কথা বলা হচ্ছে? না, জিহ্বাকে সংযত রাখার মানে হলো আপনার কথা, আপনার জবানকে সংযত রাখা, কিন্তু এখানে আলোচনা হচ্ছে অন্তরের পরিশুদ্ধি নিয়ে। ইবাদাতের সময় অন্তরের যে বিশুদ্ধতা দরকার, সেই পরিশুদ্ধি নয়, এ হলো মুমিনদের নিজেদের মধ্যকার বিশুদ্ধ অন্তর, অর্থাৎ মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা ও অন্তরের স্বচ্ছতা।

ইবনু তাইমিয়াহ (এ) এর কী ধরণের শত্রু ছিল কোনো ধারণা আছে? তাঁর শত্রুরা ছিল গভীর এবং মারাত্মক বিদআতে লিপ্ত লোকেরা। আকিদা এবং তাওহিদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইসলামিক ইস্যুতে তাঁর নীতি ও আদর্শের কারণে শাসকেরা তো বটেই, এমনকি মুসলিম আলিমরা পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল।

ইবনু তাইমিয়াহ।)-এর পেছনে কেন এত লোক লেগেছিল? তিনি তো কোনোদিন বিয়ে করেননি, শ্বশুরবাড়ির ঝামেলায় তাঁকে কখনও জড়াতে হয়নি। পিঠে জড়ানোর একটা চাদর ছাড়া তাঁর আর কোনো সম্পদ ছিল না, তাই সব ধরনের বৈষয়িক ঝামেলা থেকেও তিনি ছিলেন মুক্ত। তিনি কোনো চাকরি করতেন না, তাই তাঁকে মনিবের সাথে কোনো ধরনের ঝামেলা পোহাতে হয়নি। দিনের বেশিরভাগ সময় তিনি মসজিদে কাটাতেন, সুতরাং বাড়িওয়ালার সাথে ঝগড়াঝাটি হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

অন্যদের সাথে তাঁর বিরোধের একমাত্র কারণ তাহলে কী ছিল? কারণটা ছিল আকিদাগত বিষয়ে তাঁব দৃঢ় অবস্থান।

কিছু আলিমদের ষড়যন্ত্রের ফলে ইবনু তাইমিয়াহ।)-কে জেলে যেতে হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি জেলে থাকা অবস্থাতেই দাবার ছক উল্টে গেল। নতুন যে শাসক এলেন তিনি পুরোনো শাসক এবং সেইসব আলিমদেরকে ঘৃণা করতেন। তিনি ইবনু তাইমিয়াহ।।-কে কারাগার থেকে মুক্ত করে তাঁকে সম্মানিত করেন, আর তাঁকে বন্দী করার পেছনে যে সমস্ত আলিমদের হাত ছিল, তাদেরকে জেলবন্দী করেন। তিনি ইবনু তাইমিয়াহ (৯)-কে তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলার অনুরোধ করলেন। তিনি ইতিমধ্যেই তাদেরকে ঘৃণা করতেন, তবু প্রমাণস্বরূপ ইবনু তাইমিয়াহ()-এর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইলেন যাতে তিনি তাদের হত্যা করতে পারেন।

ইবনু তাইমিয়াহ (৯)-এর মুখ থেকে শুধু একটিমাত্র কথা শোনার অপেক্ষা, আর এরপরই তাদের হত্যা করা হবে-এটাই তাঁর ইচ্ছা ছিল। কেননা, সেই শাসক তাদেরকে ও তাদের প্রাক্তন নেতাকে ঘৃণা করত। কিন্তু ইবনু তাইমিয়াহ (৯) বললেন, "এরা হচ্ছেন উলামা এবং এদেরকে বন্দী করা হলে উম্মাহর উপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে।"

আহমাদ ফরিদ ইবনু তাইমিয়াহকে নিয়ে লেখা তাঁর একটি গ্রন্থে বলেন, "ইবনু মাখলুফ ছিলেন তাঁর সময়কার বিখ্যাত মালিকি ইমামদের একজন। যখন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো, তিনি বললেন, আমি আমার জীবনে ইবনু তাইমিয়াহর মতো এত মহানুভব আর কাউকে দেখিনি। আমরা ইবনু তাইমিয়াহর বিরুদ্ধে শাসকদের ক্ষেপিয়ে তুলে তাঁকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। অথচ মুক্তি পাওয়ার পর যখন তাঁর অবস্থান আমাদের চেয়ে উত্তম হলো, যখন মাত্র একটা কথার দ্বারা তিনি আমাদের হত্যা করতে পারতেন- তখন তিনি তা না করে আমাদের জান বাঁচিয়ে দিলেন। আমাদের পক্ষ নিয়ে কথা বললেন- আমাদের প্রশংসা করলেন!"

ইবনুল কাইয়িম (এ) তাঁর উস্তাদ ইবনু তাইমিয়াহ(এ)-এর ব্যাপারে বলেন, "আমি ইবনু তাইমিয়াহর মতো আর কাউকে দেখিনি। তিনি কখনও তার শত্রুদের অভিশাপ দেননি।" ইবনুল কাইয়িম আরও বলেন, "আমি একবার তাঁর কাছে একটা সুসংবাদ জানাতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী সুখবর এনেছ, হে ইবনুল কাইযিম? আমি তাকে বললাম যে তাঁর খুব বড় একজন শত্রু মারা গেছে।"

ইবনুল কাইয়িম তাঁর শাইখকে এই খবরটা দিতে গিয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ইবনু তাইমিয়াহ এই খবরটা শোনার সাথে সাথে বললেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন, মুসলিমের মৃত্যু কখনও সুসংবাদ হতে পারে না।"

ইবনুল কাইয়িম বলেন, "এরপর ইবনু তাইমিয়াহ তৎক্ষনাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং তার পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাদের বাড়িতে গেলেন। তিনি মৃত ব্যক্তির সন্তানদের নিকট গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের বাবার মতো। তোমরা তোমাদের বাবাকে হারিয়েছ ঠিকই কিন্তু আজ থেকে আমাকে তোমরা তোমাদের বাবার মতো। জানবে। তোমাদের যদি কখনো কিছু প্রয়োজন হয়, তবে আমাকে জানিও।"

তারা এ কথা শুনে খুব খুশি হলো। তারা ইবনু তাইমিয়াহকে অত্যন্ত ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত।

দেখুন, ক্ষমার কী চমৎকার দৃষ্টান্ত। অথচ ঐ ব্যক্তি ছিল ইবনু তাইমিয়াহর সবচেয়ে বড় শত্রু। ইবনুল কাইয়িম বলেন, "ইবনু তাইমিয়াহর প্রতি তাঁদের সীমাহীন ভালবাস। আর সম্মানের কারণ ছিল-তিনি একজন পরিষ্কার মনের মানুষ ছিলেন।"

ইবনু তাইমিয়াহর একজন ছাত্র একবার আফসোস করে বলেছিলেন, "ইশ, ইবনু তাইমিয়াহ তাঁর শত্রুদের সাথে যে আচরণ করেছেন, আমি যদি আমার বন্ধুদের সাথে তা করতে পারতাম। আমার যদি ক্ষমা করার এমন গুণ থাকত!"

এই বামাদানে আমরা আল্লাহর সাথে একটা নতুন অধ্যায় শুরু করেছি, এখন চলুন মুসলিমদের সাথেও একটা নতুন অধ্যায় শুরু করি।

আলি ইবন আবি তালিব।) এর নাতি আলি ইবনু আল হুসাইনের একজন কাজের মহিলা ছিল। একদিন সে হুসাইনের জন্য এক বালতি ওযুর পানি আনতে গেল। ওযুর পানি ঢালতে গিয়ে বালতিটাই তাঁর মাথায় পড়ে গেল। ফলে তিনি বেশ আঘাত পেলেন। সাথে সাথে কাজের মহিলাটি বলে উঠল সূরাহ আল ইমরানের ১৩৪ নম্বর আযাতের একটি কথা, "যারা তাঁদের রাগকে দমন করে।" সঙ্গে সঙ্গে আলি ইবনু হুসাইন বলে উঠলেন, আমি আমার রাগকে দমন করলাম। একে তাঁর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, আর কাজটার জন্য দায়ী তাঁর কাজের লোক। তবুও তিনি তাকে কিছু বললেন না। কাজের মহিলাটাও জানত সে কার সাথে কথা বলছে। কাজের মহিলাটি এরপর বলল, "যারা মানুষকে ক্ষমা করে।" এটাও সূরাহ আলে ইমবানের ১৩৪ নম্বব আয়াতে আছে। আলি ইবনু হুসাইন বললেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। আমি আমার বাগ দমন করলাম আর তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

কাজের মহিলাটি এরপর আয়াতটি শেষ অংশটুকুও বললেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন।” অর্থাৎ ভালো কাজ যারা করে, তাদেরকে ভালোবাসেন। এরপর আলি ইবনু হুসাইন বললেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আজ থেকে তুমি মুক্ত।"

মনে করুন, আপনার মা, মেয়ে বা বোনের নামে কেউ একটা বাজে কথা বলল। আল্লাহ হিফাযত করুক যেন আমাদেরকে কখনও এমন পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়। চিন্তা করুন, তখন আপনার কেমন লাগবে? আপনার রক্ত গরম হয়ে যাবে। আর যদি সেই ব্যক্তি হয় এমন কেউ যাকে আপনি বছরের পর বছর ধরে সাহায্য করে আসছেন,

আর এখন সে আপনার একেবারে কাছের একজনের ব্যাপারে খারাপ কথা বলছে- কেমন লাগবে আপনার?

মিসতা ইবনু উসাসা হলো এমন একজন। সে ছিল অত্যন্ত গরিব, আবু বকর (৬। তাকে প্রতি মাসে সাহায্য করতেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আবু বকরের সাহায্য দিয়েই লোকটির সংসার চলত। যখন লোকেরা আইশা (এ) কে অপবাদ দিল, তখন এই লোকও মা আইশার নামে বাজে কথা ছড়াল। যার কারণে আবু বকর (৬) তাকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। কিছুদিন পর পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে এলো, আল্লাহ আইশা।। এর পবিত্রতার ঘোষণা দিয়ে কুরআনে আয়াত নাযিল করলেন। এরপর বিশেষভাবে আবু বকর (৬)-কে নিয়ে কুরআনে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

"আল্লাহ্ যাদেরকে ধন সম্পদ দিয়েছেন, তারা যেন নিজের আত্মীয় স্বজন আর গরিবদেরকে তা না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না করে; এবং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের বাড়িঘর ত্যাগ করেছে, তাদেরকে যেন ক্ষমা করে দেয়। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন? আর আল্লাহ হচ্ছেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরাহ নূর ২৪:২২)

আপনি যদি চান আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, তাহলে আপনিও মানুষকে ক্ষমা করে দিন। আপনার রামাদানও এভাবেই শেষ করুন। মানুষকে ক্ষমা করে দিয়ে আর আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা নিয়ে।

আবু বকর (৬) বলেন, "ওয়াল্লাহি, হে আমাদের রব! আমরা তোমার ক্ষমাকে ভালোবাসি।"

এরপর তিনি সেই লোকটির কাছে যান এবং আবার তাকে সাহায্য করতে শুরু করেন। হ্যাঁ সেই লোকের কাছে-যে কিনা তাঁর নিজের মেয়েকে নিয়ে খারাপ কথা ছড়িয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবার সিয়াম আর অন্যান্য সকল ইবাদাতকে কবুল করে নিন। আরো অনেকবার রামাদান দেখার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে একত্রিত হওয়ার তাওফিক দেন। আমীন।

★ তথ্যসূত্রঃ শাইখ আহমাহ মূসা জিবরীল ধূলিমলিন উপহার রামাদান এবং মুহাম্মদ ফারিস আলী হাম্মুদা প্রোডাক্টিভ রামাদান বই থেকে কিছু অংশ নেওয়া হয়েছে।